তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

১

এতে রয়েছে

- মূল কুরআনুল কারীম
- অনুবাদ : আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর তরজমার অনুকরণে
- শব্দে শব্দে অনুবাদ
- শানে নুযূল / কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট
- তাফসীর : মুফতি শফী (র.)-এর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের অনুকরণে
- আয়াত ও সূরার পূর্বাপর সম্পর্ক : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)-এর অনুকরণে
- আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি
- প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল
- শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ
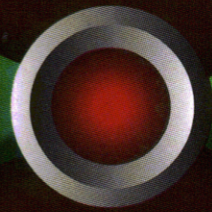
ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা

المكتبة الإسلامية

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

[১ম থেকে ৫ম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক

লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (১ম খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম

২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস

২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم - "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رحمة للعالمين ﷺ : تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتى -

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্রময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

✧ বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ اٰيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتّٰى يَعْرِفَ مَعَانِيْهِنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

“আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)।

সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– ‘তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।’ দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

“আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন–

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰي نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهٖ وَحِكَمِهٖ -

অর্থাৎ, এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ اَوْ اَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا অর্থাৎ, (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

✧ ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুতি, হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত

করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্দেলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
৪১১দক্ষিণ, মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা
২৩/০৭/২০১৩ ইং
১৩ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- **মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক**
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা আব্দুল আলীম**
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হুসাইন**
  ফাযেল দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- **মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী**
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন**
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান**
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হুসাইন**
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

সূচিপত্র

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

২য় পারা

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٤٢)

অনুবাদ (১৪২) এখন তো নির্বোধেরা বলবেই যে, তারা [মুসলমান] যে দিকে পূর্বে মুখ করত, নিজেদের কেবলা হতে তাদেরকে এখন কিসে ফিরিয়ে দিল? আপনি বলে দিন, মাশরেক এবং মাগরেব আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথ প্রদর্শন করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٤٣)

(১৪৩) আর এরূপে আমি তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় করেছি যারা মধ্য পন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতিপক্ষে সাক্ষী হও, আর রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী, আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন তা তো শুধু এজন্য ছিল, যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়– কে রাসূলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়, আর এই কেবলা পরিবর্তন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন [তাদের ব্যতীত] আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন, বাস্তাবিকই আল্লাহ মানুষের প্রতি খুবই স্নেহশীল, করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

১৪২. سَيَقُوْلُ এখন তো বলবেই السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ নির্বোধেরা مَا وَلّٰهُمْ তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল عَنْ قِبْلَتِهِمُ নিজেদের কেবলা হতে الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا তারা [মুসলমান] যে দিকে পূর্বে মুখ করত قُلْ আপনি বলে দিন لِّلّٰهِ আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ মাশরেক এবং মাগরেব يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন প্রদর্শন করেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথ।

১৪৩. وَكَذٰلِكَ আর এরূপে جَعَلْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে করেছি اُمَّةً এমন এক সম্প্রদায় وَّسَطًا যারা মধ্য পন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ যেন তোমরা সাক্ষী হও عَلَى النَّاسِ অন্য লোকের প্রতিপক্ষে وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ আর রাসূল হবেন عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا তোমাদের সাক্ষী وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন তা তো শুধু এজন্য ছিল اِلَّا لِنَعْلَمَ যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়– مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ কে রাসূলকে অনুসরণ করে مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ আর কে পশ্চাৎপদ হয়, وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً আর এই কেবলা পরিবর্তন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন [তাদের ব্যতীত] وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ এমন নন যে, لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন اِنَّ اللّٰهَ বাস্তাবিকই আল্লাহ بِالنَّاسِ মানুষের প্রতি لَرَءُوْفٌ খুবই স্নেহশীল رَّحِيْمٌ করুণাময়।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٤٤)

অনুবাদ : (১৪৪) আমি আকাশের দিকে বারংবার আপনার মুখমণ্ডল উঠাতে দেখছি, তাই আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিব সেই কেবলার দিকে যা আপনি পছন্দ করেন, তবে আপনার চেহারা [নামাজে] মসজিদে-হারামের [কাবার] দিকে ফিরিয়ে নিন, আর তোমরা যেখানেই থাক স্বীয় চেহারা ঐদিকেই ফিরাও; আর এই আহলে কিতাবরাও দৃঢ়রূপে জানে যে, এটা খুবই সত্য তাদের প্রভুরই পক্ষ থেকে, আর আল্লাহ তাদের এসব কার্যকলাপ হতে মোটেই বেখবর নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٤٥)

وقف لازم

(১৪৫) আর যদি আপনি আহলে কিতাবদের সম্মুখে যাবতীয় প্রমাণাদিও উপস্থিত করেন, তবু তারা আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না, আর আপনিও তাদের কেবলাকে গ্রহণ করতে পারেন না, এবং তাদের কোনো দলই অন্য দলের কেবলাকে গ্রহণ করে না, আর যদি আপনি তাদের আত্ম-প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করেন– আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয় আপনি জালেমদের মধ্যে পরিগণিত হবেন।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۗ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤٦)

وقف منزل

(১৪৬) যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা রাসূলকে এরূপ চিনে যেরূপ তারা আপন পুত্রগণকে চিনে থাকে, আর নিশ্চয়, তাদের কেউ কেউ বাস্তব সত্যকে ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও গোপন করছে।

শাব্দিক অনুবাদ

১৪৪. قَدْ نَرٰى আমি দেখেছি تَقَلُّبَ وَجْهِكَ বারংবার আপনার মুখমণ্ডল উঠাতে فِي السَّمَآءِ আকাশের দিকে فَلَنُوَلِّيَنَّكَ তাই আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিব قِبْلَةً সেই কেবলার দিকে تَرْضٰهَا যা আপনি পছন্দ করেন فَوَلِّ وَجْهَكَ তবে আপনার চেহারা ফিরিয়ে নিন [নামাজে] شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে-হারামের [কা'বার] দিকে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ আর তোমরা যেখানেই থাক فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ স্বীয় চেহারা ফিরাও شَطْرَهٗ ঐদিকেই وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর এই আহলে কিতাবরাও لَيَعْلَمُوْنَ দৃঢ়রূপে জানে যে اَنَّهُ الْحَقُّ এটা খুবই সত্য مِنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুরই পক্ষ হতে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ মোটেই বেখবর নন عَمَّا يَعْمَلُوْنَ তাদের এসব কার্যকলাপ হতে ।

১৪৫. وَلَئِنْ اَتَيْتَ আর যদি আপনি উপস্থিত করেন الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের সম্মুখে بِكُلِّ اٰيَةٍ যাবতীয় প্রমাণাদিও مَا تَبِعُوْا তবু তারা গ্রহণ করবে না قِبْلَتَكَ আপনার কেবলাকে وَمَآ اَنْتَ আর আপনিও بِتَابِعٍ গ্রহণ করতে পারেন না قِبْلَتَهُمْ তাদের কেবলাকে وَمَا بَعْضُهُمْ এবং তাদের কোনো দলই بِتَابِعٍ গ্রহণ করে না قِبْلَةَ بَعْضٍ অন্য দলের কেবলাকে وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ আর যদি আপনি গ্রহণ করেন– اَهْوَآءَهُمْ তাদের আত্ম-প্রবৃত্তিকে مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ তবে নিশ্চয় আপনি জালেমদের মধ্যে পরিগণিত হবেন।

১৪৬. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি يَعْرِفُوْنَهٗ তারা রাসূলকে এরূপ চিনে كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ যেরূপ তারা আপন পুত্রগণকে চিনে থাকে وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ আর নিশ্চয় তাদের কেউ কেউ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ বাস্তব সত্যকে গোপন করছে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪২) قوله سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : উল্লিখিত আয়াত দ্বারা রাসূলে মাকবুল ﷺ-কে 'গায়েব' সম্পর্কে জানানো হয়েছে। মক্কায় অবস্থান কালে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে মুসলমানগণ নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের পর বায়তুল মাকদিসের দিকে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে ষোল বা সতের মাস অতিক্রমের পর পুনরায় কা'বা শরীফের প্রতি প্রত্যাবর্তনের হুকুম প্রদান করা হয়। এই শেষ নির্দেশের পর মক্কার ও মদীনার অমুসলিম সমাজ যে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাঁর নবীকে জানিয়ে উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। –[তাফসীরে বায়জাবী, তাফসীরে জালালাইন]

(১৪৩) قوله وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে, ইহুদি নেতারা কেবলা পরিবর্তনের পর বিশিষ্ট সাহাবী মু'য়ায ইবনে জাবালকে লক্ষ্য করে বলে, "হে মু'য়ায! আমাদের কেবলা বায়তুল মাকদিস বিগত সকল নবীদের কেবলা। আর মুহাম্মদ ﷺ এ কথা জানেন যে, আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তবুও সে হিংসা ও বিদ্বেষ বশতঃ আমাদের কেবলা ত্যাগ করেছে। উত্তরে হযরত মু'য়ায (রা.) বললেন, হে দুর্ভাগা জাতি! সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো কিভাবে? শ্রেষ্ঠত্ব আর মর্যাদা তো কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য। তখন মহান আল্লাহ মু'য়াযের কথার সমর্থনে উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

(১৪৩) قوله وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : কেবলা পরিবর্তনের পর মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে হুয়াই ইবনে আখতাবসহ অন্যান্য ইহুদিরা মুসলমানদের বলতে শুরু করে, "হে মুসলমানগণ! আমাদের কেবলা যদি সঠিক না-ই হয়ে থাকে আর যদি কা'বা ঘরই প্রকৃত কেবলা হয়ে থাকে, তবে ইতোপূর্বে যারা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের পরিণতি কি হবে? তারা কি জান্নাত পাবে, না জাহান্নামে যাবে? তাদের এরূপ প্রশ্নে মুসলমানদের মনেও সংশয় দেখা দেয়। তখন তাদের সংশয় নিরসনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি অবতীর্ণ করেন।

(১৪৪) قوله قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবী করীম ﷺ মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় ইহুদি সম্প্রদায় বাস করত। তাদের কেবলা হলো বায়তুল মাকদিস। আল্লাহ তা'আলা তাদের মন জয় করার লক্ষ্যে নবী করীম ﷺ-কে সেদিকে ফিরে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেন। অবশ্য তা কুরআন শরীফে বিবৃত হয়নি। মুসলমানরা ষোল বা সতের মাস এভাবে নামাজ আদায় করেন। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ঐকান্তিক কামনা ছিল কেবলায়ে ইব্‌রাহীমী কা'বা কেবলা হিসেবে পুনঃ নির্ধারণ করা। এ সম্পর্কিত নির্দেশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজীর নিকট আগমন করবেন, এই আশায় তিনি বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করে এই হুকুম নাজিল করেন, কা'বা শরীফকে সব সময়ের জন্য মুসলিম উম্মাহর কেবলা হিসেবে নির্ধারণ করেন। হিজরি দ্বিতীয় সনের রজব বা শা'বান মাসে এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিন বনূ সালামা গোত্রের হযরত বিশর ইবনে বারারাহ (রা.)-এর ঘরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সে এলাকার মসজিদে যুহরের নামাজ আদায়কালে এই নির্দেশ আসে। তখন তাঁরা নামাজের তৃতীয় রাকাতে ছিলেন। নির্দেশ আসার সাথে সাথে রাসূল ﷺ নামাজের মাঝেই কা'বা শরীফের দিকে ঘুরে যান। এজন্য ঐ মসজিদটিকে 'মসজিদে যুল কিবলাতাইন'বা দুই কিবলার স্মৃতিবাহী মসজিদ' বলা হয়। ইহুদি জ্ঞান-পাপীরা তখন নানা ধরনের কটুক্তি করতে শুরু করে। তারা বলতে থাকে, নবীজী শিরকের প্রতি আসক্তি বশতঃ ও মুশরিকদের সন্তোষ কামনায় কা'বা শরীফকে কেবলা নির্ধারণ করেছেন। এর জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলে দেন যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই অন্যায় প্রচারণা চালাচ্ছে। নতুবা নবীজীর কেবলা-পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের কিতাবেও উল্লিখিত হয়েছে। তাই, এটি আপত্তি করার বিষয় নয়, বরং নবীজীর সত্যতারই এক সুস্পষ্ট নিদর্শন বৈকি।

(১৪৫) قوله وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে, মদিনার ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানরা মহানবী ﷺ-কে বলেছিল, পূর্ববর্তী নবীদের মতো আপনিও নিদর্শন নিয়ে আসুন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। তবে মূলতঃ এই আয়াতটি কিবলা পরিবর্তনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, নতুন কোনো কারণে তা অবতীর্ণ হয়নি।

(১৪৬) قوله اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনায় হিজরতের পর যখন নবী করীম ﷺ বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে থাকেন, তখন মদিনার ইহুদিরা বলতে থাকে, ইনি নিজেকে শেষ নবী দাবি করেন এবং কা'বা শরীফের পরিবর্তে এখন বায়তুল মাকদিসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই আমাদের দীন যে সত্য তা প্রমাণিত হলো। আর সে জন্যই তিনি একটু একটু করে আমাদের ধর্মের দিকে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু যখন নবীজী ﷺ আবার কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে শুরু করেন, তখন তারা নানা রকম কটু-কাটব্য করতে থাকে। এমন কথা-বার্তা বলতে থাকে যেন তারা রাসূল ﷺ সম্পর্কে কিছু জানেই না। অথচ, তাওরাত ও ইনজীলে নবীজীর যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, এমনকি কেবলা পরিবর্তনের কথাও বিবৃত হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করে তাদের চরিত্র সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করে দিলেন যে, তারা নবীজীকে নিজ সন্তানের ন্যায় পরিস্কারভাবে চিনে, কিন্তু তথাপি না চেনার ভান করে সত্যকে গোপন রাখে।

قوله سَيَقُوْلُ **-এর হিকমত :** এখনো কেবলা পরিবর্তিত হয়নি। নির্বোধরাও কোনো প্রকার মন্তব্য করেনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে এর পূর্বে নির্বোধ লোকেরা কি বলবে তা জানিয়ে দিলেন। এর কতিপয় হিকমত রয়েছে। যথা–(১) নির্বোধদের মনের কথা নবীজী যদি পূর্বেই বলে দেন তাহলে তারা এটাকে মু'জিযা হিসেবে ধরে নিবে যা হবে তাঁর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য। (২) কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধদের অশালীন বিদ্রূপাত্মক কথা থেকে নবীজী যেন মনে কষ্ট অনুভব না করেন তাই সেই কথাগুলো আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (৩) নির্বোধদের অবান্তর প্রশ্নের জবাবে নবীজী কি উত্তর প্রদান করবেন তা আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারেন। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ **-এর ব্যাখ্যা :** صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ হলো আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পথ। মক্কী জীবনে যারা কা'বাকে কেবলা করে নামাজ পড়েছেন তারাই আবার মদিনা জীবনে এসে দীর্ঘ সতের মাস বায়তুল মাকদিসকে কেবলা করে নামাজ পড়েছেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেন তাঁর অনুসরণ করাই তাদের কর্তব্য।

পুনরায় কা'বাকে কেবলা ঘোষণা করে আল্লাহ মূলতঃ পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, কারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী আর কারা আত্মপূজারী। কাজেই এই পরিবর্তনকে যারা মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে তারাই صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ পেয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকেই صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এ চালিত করেছেন।

قوله وَكَذٰلِكَ **-এর মর্ম :** وَكَذٰلِكَ "আর এমনিভাবে" কথাটির উদ্দেশ্য এই হতে পারে–

- ➢ তোমাদের কেবলাকে যেমন পৃথিবীর মধ্যস্থানে করে দিলাম, এমনিভাবে তোমাদেরকে সকল জাতির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী উম্মত করে দিলাম।
- ➢ কা'বা যেমন পৃথিবীর মধ্যস্থানে অবস্থিত, তোমরাও তেমনি নবী এবং অন্যান্য উম্মতের মধ্যভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ, তোমরা নবীদের নিচে এবং অন্যান্য জাতির উপরে। –[তাফসীরে কুরতুবী]
- ➢ অথবা, কথাটির অর্থ এ হতে পারে যে, কা'বাকে পুনরায় কেবলা করে যেমন বিশ্ববাসীর মধ্যমণিতে পরিণত করেছি তেমনি তোমাদেরকেও সকল জাতির মধ্যমপন্থি জাতি বানিয়েছি। কারণ মধ্য বিন্দুকে কেন্দ্র করেই বাকিরা ঘুরে।

قوله اُمَّةً وَّسَطًا **-এর মর্মার্থ :** اُمَّةً وَّسَطًا অর্থ মধ্যমপন্থি জাতি, উত্তম, ন্যায়পরায়ণ জাতি। এর দ্বারা এমন উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা ন্যায় নীতি ও মধ্যমপন্থা অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যারা বিশ্বের জাতিসমূহের নেতা, পরিচালক, বিচারক ও কর্তা হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মাদারেক প্রণেতা বলেন, وسط শব্দের অর্থ হলো উত্তম; যেহেতু প্রতিবেশীরা দোষ-ত্রুটি নিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে আসে তাই তারা প্রশংসিত ও ন্যায়পরায়ণ। তারা প্রতিবেশীদের মধ্যে কারো পক্ষপাতিত্ব করে না।

অথবা, اُمَّةً وَّسَطًا দ্বারা "মধ্যস্থতাকারী জাতি" অর্থও হতে পারে। কারণ যারা মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করে তারাই সমাজের নেতা, পরিচালক ও বিচারক।

মুসলমানদেরকে أُمَّةً وَّسَطًا বলার কারণ : তারা আল্লাহর হুকুম পালনে কমও করে না বেশিও করে না। তারা সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

- ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। খ্রিস্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলেছে আর ইহুদিরা তাকে অবৈধ সন্তান বলেছে। এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ যা হক তাই বলেছে।
- তাছাড়া মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা ও বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এ সকল কারণে মুসলমানদেরকে أُمَّةً وَّسَطًا বলা হয়েছে। أُمَّةً وَّسَطًا কেই অন্যত্র خَيْرَ أُمَّةٍ বলা হয়েছে।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ : (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর উপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থি, বাস্তবতার নিরীখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর :

১. اِعْتِدَالٌ [ভারসাম্য]-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া। عَدْلٌ মূলধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عَدْلٌ-এর অর্থও সমান হওয়া।

২. যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে তা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, 'মেজাযে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ক্রটিই মানবদেহে রোগ-বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেজায-পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারটি উপাদান-রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরি। এ চারটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহের প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোনো একটি উপাদান মেজাযের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে তাই মৃত্যুরকারণ হবে।

এই স্থূল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে আসুন। আধ্যাত্মিকতায় ভারসাম্যের নাম আত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজীবের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষ এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশি থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ 'আশরাফুল–মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস চর্ম এবং তাপ শৈত্যের উর্ধ্বে অন্য কোনো বিষয় যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান- অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোনো সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মতো মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেজায ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এবং আমাদের রাসূল ﷺ তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সর্বপ্রধান কামেল মানব।

আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেন-দেন ও পারস্পরিক আদান প্রদানে বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানদণ্ড নাজিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়ত হতে পারে। শরিয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানি গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডলীর সুস্থতা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত : মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, وَسَطًا শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে কোনো সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থি, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানি গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কুরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদানুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানি গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোনো ব্যাপারে কলহবিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোনো আশঙ্কা নেই। সূরা আলে ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।

অর্থাৎ, মুসলমানরা যেমন সব পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতার গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজায এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোনো বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি গণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে–

বিশ্বাসের ভারসাম্য : সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে– "ইহুদিরা বলেছে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলেছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।" অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গম্বরের উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদে পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোনো ন্যায়যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, "আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।" আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহ মনে করে। এত সব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তারা আল্লাহর দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখেও প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভিতরে থাকে।

কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য : বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরিয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ, উৎকোচ নিয়ে আসমানি গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নিয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং সহ্য করাকেই ছওয়াব ও ইবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রলায়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য : এর পর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোনো কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ন-নির্যাতন, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হতো না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হতো। জীব-হত্যাকে তো দস্তুর মতো মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হতো। আল্লাহর হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হতো অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য : এরপর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য করুন, এটাও বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামি শরিয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোনো পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোনো মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত : لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফিকহ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে।

ইজমা শরিয়তের দলিল : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, ইজমা [মুসলিম ঐকমত্য] যে শরিয়তের একটি দলিল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলিল করে দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলিল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়ীগণের জন্য এবং তাবেয়ীগণের ইজমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্যে দলিল স্বরূপ।

তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে– এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোনো অর্থ থাকে না।

ইমাম জাস্সাস (র.) বলেন– এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। 'ইজমা শরিয়তের দলিল' এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোনো যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাজিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই 'আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা'। তাদের উক্তি দলিল। তারা কোনো ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাজের কেবলা হয় : হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামাজ ফরজ হয়, তখন কা'বা গৃহই নামাজের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল- মাকদিস ছিল এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল মাকদিস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামীনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদিনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।–[ইবনে কাসীর]

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন– মক্কায় নামাজ ফরজ হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তেন। মদিনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল মাকদিস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদিনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ, কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

বনূ-সালামার মুসলমানগণ জোহর অথবা আসরের নামাজ থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে দেন। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাজে পৌছালে তারাও নামাজের মধ্যেই বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।–[ইবনে কাসীর, জাস্সাস]

قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ –এখানে ঈমান শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোনো কোনো হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামাজ। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে যেসব নামাজ পড়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আ'যেব (রা.) এবং তিরমিযীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতোমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল মাকদিসের দিকে নামাজ পড়ে গেছেন– কা'বার দিকে নামাজ পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এতে নামাজকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাজই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।

আলোচ্য ১৪৪ তম আয়াতের প্রথম বাক্যে কা'বার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকর্ষণ এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সবই সম্ভবপর। উদাহরণত মহানবী ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তাঁর শরিয়তকে দীনে ইবরাহীমের অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

আরো কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবি করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল মাকদিস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল/সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মদিনার ইহুদিরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক– এটাই ছিল মহানবী ﷺ -এর আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহর নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোনো দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে, না জানা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কোনো দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সেদিকেই ফিরিয়ে দিব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে দিকে মুখ করার আদেশ নাজিল করা হয়, যথা, فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়।

নামাজে কেবলামুখি হওয়ার মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সর্বদিকই সমান। قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পূর্ব -পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি দিককে কেবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল মাকদিসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী ﷺ -এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে فَوَلِّ وَجْهَكَ اِلَى الْكَعْبَةِ অর্থাৎ, 'কা'বার দিকে মুখ করে অথবা বায়তুল্লার দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে] বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমত : যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ তথা কা'বা; কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টিগোচর থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরিয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

বায়তুল্লাহ অপেক্ষা মসজিদুল হারাম অনেক বেশি স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যও সহজ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ إِلَى -এর পরিবর্তে شَطْرَ শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে গেছে। شَطْرَ দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়– বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বুঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করাও জরুরি নয়; বরং মসজিদে-হারাম যেদিকে অবস্থিত সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। –[বাহরে মুহীত]

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ– আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইহুদি-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোনো স্থিতি নেই; ইতঃপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল মাকদিস হলো, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে কা'বা হলো। আবারও হয়তো বদলে বায়তুল মাকদিসকেই কেবলা বানিয়ে নিবে। –[বাহরে মুহীত]

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুজুর ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম -ও যদি এমনটি করেন, [অবশ্য তা অসম্ভব], তবে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا الخ : নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে রাসূল হিসেবে চেনার উদারহণ সন্তানদের চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যেমন কোনোরকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবতঃ পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভালো করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো এই যে, পিতা-মাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ পিতা-মাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করেন। তাদের শরীরের এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনো দেখে না।

কা'বার প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার কারণ : কা'বা ঘরকে মুসলমানদের কেবলা করা হোক, এটা নবীজী মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতেন। এমনকি এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়াও করতেন। কা'বার প্রতি নবীজীর এ ভালোবাসার কিছু কারণ অনুমান করা হয়। যথা–

সহজাত প্রবৃত্তি : নবীজী কা'বার পাশে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে কা'বার ভিতরে নিয়ে যান এবং সেখানেই তার নাম মুহাম্মদ রাখেন। তাছাড়া পরিণত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রথমত কা'বা-ই ছিল তাঁর কেবলা। এসব আনুসাঙ্গিকতার ফলে কা'বার সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি টান ছিল অনেক।

বংশীয় টান : নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, চাচা আব্বাস, আবু তালিব প্রমূখ ছিলেন কা'বার সংস্কারক ও প্রতিনিধি। তাছাড়া নবীজী নিজেও কা'বা সংস্কারে অংশ নিয়েছেন। নিজ হাতে স্থাপন করেছেন মূল্যবান হাজরে আসওয়াদ। এরূপ সংশ্লিষ্টতার কারণে কা'বার প্রতি তাঁর বংশীয় টান কিছুটা বেশি থাকাই স্বাভাবিক।

ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি ভক্তি : নবীজী প্রথম থেকেই মিল্লাতে ইবরাহীমের ভক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনে তাঁকে মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর অটল থাকার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা ছিল কা'বা ঘর। তাই স্বভাবতই তিনি ইবরাহীমের কিবলা তাঁর উম্মতের কিবলা হোক এটাই চাচ্ছিলেন।

মক্কার মুশরিকদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করণ : মক্কার মুশরিকরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করত এবং কা'বা ঘরকে তারা কেবলা মানত। নবীজী ﷺ ভাবলেন কা'বা কে যদি কেবলা বানানো হয় তবে মুশরিকরা হয়তো খুশি হয়ে ইসলাম ধর্ম মেনে নেবে।

ভৌগলিক কারণ : অবস্থানের দিক দিয়ে বায়তুল মাকদিসের তুলনায় কা'বাঘর ছিল মুসলমাদের জন্য অনুকূলে। সর্বোপরি বলা যায় যে, কা'বাকে কেবলা বানানো আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তাই নবীজীর মনে-এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল।

مَسْجِد حَرَامْ-এর পরিচয় : "কা'বা"কে সাধারণতঃ بَيْتُ اللّٰهِ বলা হয়। বায়তুল্লাহকে ঘিরে চারপাশে নামাজের জন্য যে বিস্তৃর্ণ জায়গা রয়েছে তাকে مَسْجِد حَرَامْ বলা হয়। بَيْتُ اللّٰهِ মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মসজিদকে হারাম বলার কারণ : (১) حَرَامْ শব্দের অর্থ যদি ধরা হয় নিষিদ্ধ। তবে এর কারণ হবে এই বায়তুল্লাহর সীমানার ভিতর যুদ্ধ বিগ্রহ, উচ্চ-বাচ্য, আচার-বিচার, হত্যা-খুন, গাল-মন্দ, পশু-পাখী শিকার, এমনকি গাছের পাতা ছেড়াও নিষিদ্ধ। তাই এই মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। (২) আর حَرَامْ অর্থ যদি ধরা হয় সম্মানিত। তবে তো কারণ খোঁজার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। সম্মানিত হওয়ার জন্য আল্লাহর ঘর حَرَامْ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াই যথেষ্ট। তাছাড়া এর বিশেষ সম্মানের কারণেই এর সীমানায় উল্লিখিত অন্যায় আচরণসমূহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কেবলা পরিবর্তনের মূল সময় : কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত উপরিউক্ত আয়াতগুলো হলো মূল প্রত্যাদেশ। দ্বিতীয় হিজরি সালের রজব কিংবা শা'বান মাসে এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন– নবী করীম ﷺ বনূ সালামা গোত্রের বিশর ইবনে বাররাহ ইবনে মারুর-এর গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে সে এলাকার মসজিদে যোহরের নামাজের সময় এ আয়াত নাজিল হয়। সাথে সাথে নবী করীম ﷺ ও সাহাবাগণ বায়তুল মাকদিসের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। এ কারণে এ মসজিদটিকে "মসজিদুল কিবলাতাইন" নামে অভিহিত করা হয়।

বায়তুল মাকদিসের দিকে তাকানো কি ফরজ ছিল? মদিনার জীবনে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা ফরজ ছিল কিনা ? এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। রাবী ইবনে আনাস (রা.) বলেন– তাঁর জন্য কা'বা এবং বায়তুল মাকদিসকে কেবলা গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস -এর মতে, বায়তুল মাকদিসের দিকে তাকানো ছিল ফরজ।

◈ ইবনে আনাসের দলিল হলো– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

◈ ইবনে আব্বাস -এর মতে দলিল হলো– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

বার বার আকাশের দিকে তাকানোর কারণ : কা'বা মুসলমানদের কেবলা হোক এটাই ছিল রাসূল ﷺ-এর আন্তরিক কামনা। তবে নবীগণ কোনো দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি আছে বলে না জানা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কোনো দরখাস্ত পেশ করতেন না। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কিবলা পরিবর্তনের জন্য দোয়া করছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এ সম্পর্কে কোনো ওহী নিয়ে আসছে কি-না। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়। فَلَنُوَلِّيَنَّكَ অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সে দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাজিল করা হয় যে, فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়। –[কুরতুবী]

কা'বাকে মসজিদুল হারাম বলা : কা'বা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর ঘরের নাম। কা'বা শব্দটি বায়তুল্লাহর পার্শ্ববর্তী হেরেমকে শামিল করে না। মসজিদে হারাম বললে পূর্ণ হেরেমকে বুঝায়, যেখানে কা'বাও শামিল। যা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজে দিক রক্ষা করা ওয়াজিব। হুবহু কা'বাকে সামনে রাখা ওয়াজিব নয়।– আয়াতুল আহকাম

কুরআনে মসজিদে হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ -এর উল্লেখ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে রয়েছে। এর দ্বারা কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন–

(১) اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ কা'বা। আল্লাহ বলেন– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ جِهَةَ الْكَعْبَةِ তথা কা'বার দিকে আপনার চেহারা ফিরিয়ে নিন।

(২) اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ পূর্ণ মসজিদ। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন,

صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(৩) তৃতীয় অর্থ– মক্কা শরীফ। যেমন আল্লাহ বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

(৪) চতুর্থ অর্থ হলো পূর্ব হেরেম। যেমন আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

এখানে অমুসলিমদের হেরেমে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

يَعْرِفُوْنَهٗ-এর ه সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল : অধিকাংশ ওলামার মতে ه সর্বনাম দ্বারা রাসূলে আকরাম ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। তাওরাত ও ইনজীলে রাসূল ﷺ-এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা হুজুরকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পেরেছে যেমনভাবে পিতা তার সন্তানকে চিনতে পারে। হাজার ছেলের ভীড়েও পিতা তার ছেলেকে সনাক্ত করতে ও চিনে নিতে মোটেই ভুল করে না। তাদেরও নবী পরিচিতি এ পর্যায়েই ছিল।

ইবনে আব্বাস, কাতাদা, রাবী প্রমুখের মতে ه সর্বনামটি اَمْرُ الْقِبْلَةِ বুঝাতে এসেছে। অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি যে সত্য ও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট, এ বিষয়টি নিজ সন্তানকে চেনার ন্যায় সুস্পষ্টভাবে তারা জানে ও বুঝে, যদিও তারা তা স্বীকার করে না।

قَوْلُهٗ لِيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ "তারা حَقَّ গোপন করে।" এখানে حَقَّ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(ক) মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখের মতে اَلْحَقُّ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের যাবতীয় নিদর্শন ও প্রমাণাদী উদ্দেশ্য।

(খ) কারো মতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে اَلْحَقُّ বলা হয়েছে। তবে প্রথম অভিমতটি অগ্রগণ্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَلّٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

يَشَاءُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - أ) জিনস মোরাক্কাব مَهْمُوْز لَامْ ও اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– সে চাইবে।

صِرَاطٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে صُرُطٌ অর্থ– রাস্তা, উদ্দেশ্য দীন ইসলাম।

مُسْتَقِيْمٍ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمِ فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف وَاوِىْ অর্থ– সোজা।

يَتَّبِعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে অনুসরণ করে।

لَايُضِيْعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِىْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ (ض - ى - ع) মাসদার اَلْاِضَاعَةُ জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তিনি নষ্ট করেন না।

قَدْنَرٰى : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মোরাক্কাব, مَهْمُوْز عَيْن ও نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমরা দেখতে পাই।

لَنُوَلِّيَنَّكَ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف دَرْ لَامْ تَاكِيْد بَا نُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– অবশ্যই অবশ্যই আমি পরিবর্তন করে দিব।

تَرْضٰهَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তুমি পছন্দ করবে, তুমি রাজি হবে।

وَلِّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তুমি মুখ ফিরাও।

وَلُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনসে لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

اَتَيْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– তুমি এসেছ।

اَتْبَعْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ– (ت . ب . ع) জিনসে صَحِيْح অর্থ– তুমি অনুসরণ করতে।

বাক্য বিশ্লেষণ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ : এখানে سَيَقُوْلُ হলো فِعْل আর السُّفَهَاءُ তার فَاعِلْ আর مِنَ হলো حَرْف جَارّ এবং النَّاسِ তার مَجْرُوْر অতএব جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে مَحْذُوْف -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে السُّفَهَاءُ থেকে حَالْ হয়েছে। এখন فِعْل তার فَاعِلْ সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا : এখানে مَا অর্থ اَىُّ شَىْءٍ যা مُبْتَدَأ আর وَلّٰى হলো فِعْل তাতে هُوَ ضَمِيْر টি উহ্য থেকে فَاعِلْ এই ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হলো مَا আর هُمْ হলো مَفْعُوْل আর عَنْ হলো حَرْف جَارّ আর قِبْلَةِ শব্দটি مُضَافْ ও هُمْ হচ্ছে مُضَافْ اِلَيْه এই বাক্যটি مُرَكَّبْ اِضَافِىْ হয়ে مَوْصُوْف আর الَّتِىْ হলো اِسْم مَوْصُوْل এবং كَانُوْا হলো فِعْل তাতে هُمْ ضَمِيْر হলো তার فَاعِلْ এবং عَلٰى হচ্ছে حَرْف جَارّ ও هَا তার مَجْرُوْر এখন جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে كَانُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ ; এভাবে كَانُوْا তার فَاعِلْ ও مُتَعَلِّقْ মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে صِلَة ; এখন الَّتِىْ তার صِلَة সহ صِفَتْ এখন مَوْصُوْف ও صِفَتْ মিলে হরফে জারের مَجْرُوْر ; এখন حَرْف جَارّ তার مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّقْ একত্রিত হয়ে عَنْ -এর সাথে وَلّٰى ; এভাবে وَلّٰى তার فَاعِلْ ও مُتَعَلِّقْ সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে خَبَرْ হয়েছে, مُبْتَدَأ ও خَبَرْ একত্রিত হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়েছে।

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে لِلّٰه শব্দটি جَار ও مَجْرُوْر মিলে শিবহে فِعْل ثَابِتٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَرْ مُقَدَّمْ এবং الْمَشْرِقُ হলো مَعْطُوْف عَلَيْه আর وَاوْ হলো حَرْف عَطْف ও الْمَغْرِبُ হলো مَعْطُوْف এখন مَعْطُوْف عَلَيْه তার مَعْطُوْف সহ مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ এখন مُبْتَدَأ ও خَبَرْ একত্রিত হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ : كَذٰلِكَ -এর মুশাব্বাহ বিহীটি উহ্য, মূল ইবারত হলো

كَمَآ اَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ بِالْهِدَايَةِ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا : বাক্যটিতে جَعَلْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল كُمْ প্রথম মাফউল اُمَّةً দ্বিতীয় মাফউল এবং وَسَطًا হলো حَالْ ; দ্বিতীয় মাফউলটি তার ذُو الْحَالِ ; এবং لِتَكُوْنُوْا -এর لِ এর পর اَنْ উহ্য থেকে নসব দিচ্ছে। তাই تَكُوْنُوْا -এর ل টি كَىْ -এর অর্থে গৃহীত, তাই মূল বাক্যটি ছিল, لِاَنْ تَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ ; تَكُوْنُوْا -এর خَبَرْ হয়েছে,

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً : বাক্যাংশে اِنْ প্রকৃতপক্ষে اِنَّ ছিল। তাখফীফ করে اِنْ করা হয়েছে।

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا : বাক্যটিতে يَكُوْنَ ফে'লে নাকেস, الرَّسُوْلُ তার اِسْم ও شَهِيْدًا তার خَبَرْ ; এবং جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে شَهِيْدًا এর সাথে مُتَعَلِّقْ ;

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৪৭) এই বাস্তব সত্য আপনার প্রভুর নিকট হতে সুতরাং আপনি কখনো সংশয়ীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন না।	اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (١٤٧)
(১৪৮) আর প্রত্যেক [ধর্মাবলম্বী] ব্যক্তির জন্য এক একটি কেবলা রয়েছে যার দিকে সে মুখ করে থাকে, সুতরাং তোমরা নেক কাজের দিকে ধাবিত হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে হাজির করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।	وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٤٨)
(১৪৯) আর যেখান হতে আপনি বাইরে যান স্বীয় চেহারা [নামাজে] মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন। আর নিশ্চয় এটা সম্পূর্ণ ঠিক আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে, আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে মোটেই বেখবর নন।	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٩)
(১৫০) আর যেখান হতেই আপনি বাইরে যান, নিজের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন, আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারা এর দিকেই রাখবে যেন লোকের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সুযোগ না থাকে, তাদের মধ্যে অবিচারীরা ব্যতীত। অতএব, তোমরা এরূপ লোকদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করতে থাক, আর তোমাদের প্রতি আমার প্রদত্ত নিয়মাত যেন পূর্ণ করে দিতে পারি, আর যেন তোমরা সঠিক পথে থাক।	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٥٠)

শাব্দিক অনুবাদ

১৪৭. اَلْحَقُّ এই বাস্তব সত্য مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর নিকট হতে فَلَا تَكُوْنَنَّ সুতরাং আপনি কখনো পরিগণিত হবেন না مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ সংশয়ীদের মধ্যে।

১৪৮. وَلِكُلٍّ আর প্রত্যেক [ধর্মাবলম্বী] ব্যক্তির জন্য وِّجْهَةٌ এক একটি কেবলা রয়েছে هُوَ مُوَلِّيْهَا যার দিকে সে মুখ করে থাকে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ সুতরাং তোমরা নেক কাজের দিকে ধাবিত হও اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا তোমরা যেখানেই থাক না কেন يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا আল্লাহ তোমাদের সকলকে হাজির করবেন اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ সর্ববিষয়ে قَدِيْرٌ পূর্ণ শক্তিমান।

১৪৯. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ আর যেখান হতে আপনি বাইরে যান فَوَلِّ وَجْهَكَ স্বীয় চেহারা রাখবেন [নামাজে] شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের দিকে وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ আর নিশ্চয় এটা সম্পূর্ণ ঠিক مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ মোটেই বেখবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের আমল সম্বন্ধে।

১৫০. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ আর যেখন হতেই আপনি বাইরে যান فَوَلِّ وَجْهَكَ নিজের চেহারা রাখবেন شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের দিকে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ আর তোমরা যেখানেই থাক فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ তোমাদের চেহারা রাখবে شَطْرَهٗ এর দিকেই لِئَلَّا يَكُوْنَ যেন না থাকে لِلنَّاسِ লোকের জন্য عَلَيْكُمْ তোমাদের বিরুদ্ধে حُجَّةٌ সমালোচনা করার সুযোগ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ তাদের মধ্যে অবিচারীরা ব্যতীত فَلَا تَخْشَوْهُمْ অতএব, তোমরা এরূপ লোকদেরকে ভয় করো না وَاخْشَوْنِيْ বরং আমাকে ভয় করতে থাক وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের প্রতি আমার প্রদত্ত নিয়মাত যেন পূর্ণ করে দিতে পারি وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ আর যেন তোমরা সঠিক পথে থাক।

كَمَآ اَرۡسَلۡنَا فِيۡكُمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡ عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيۡكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُمۡ مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ (١٥١)	অনুবাদ : (১৫১) যেমন আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল তোমাদের মধ্য হতে, তিনি পাঠ করে শুনাচ্ছেন তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ এবং তোমাদেরকে [কুপ্রথা থেকে] নির্মল করছেন, আর তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় শিখাচ্ছেন, আর শিখাচ্ছেন তোমাদেরকে এমন বিষয় যার কিছুই তোমরা জানতে না।
فَاذۡكُرُوۡنِيۡۤ اَذۡكُرۡكُمۡ وَاشۡكُرُوۡا لِيۡ وَلَا تَكۡفُرُوۡنِ (١٥٢)	(১৫২) অতএব, [এ নিয়ামতের দরুন] তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব, আর আমার শোকর কর এবং আমার না-শোকরি করো না।
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ	(১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।
وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَنۡ يُّقۡتَلُ فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَمۡوَاتٌ ؕ بَلۡ اَحۡيَآءٌ وَّلٰكِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ	(১৫৪) আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলো না যে, তারা মৃত; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫১) كَمَآ اَرۡسَلۡنَا যেমন আমি প্রেরণ করেছি فِيۡكُمۡ তোমাদের মধ্যে رَسُوۡلًا একজন রাসূল مِّنۡكُمۡ তোমাদের মধ্য হতে, يَتۡلُوۡ عَلَيۡكُمۡ তিনি পাঠ করে শুনাচ্ছেন তোমাদেরকে اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ وَيُزَكِّيۡكُمۡ আর তোমাদেরকে নির্মল করছেন وَيُعَلِّمُكُمُ এবং তোমাদেরকে শিখাচ্ছেন الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় وَيُعَلِّمُكُمۡ আর শিখাচ্ছেন তোমাদেরকে مَّا لَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ এমন বিষয় যার কিছুই জানতে না।

(১৫২) فَاذۡكُرُوۡنِيۡۤ অতএব, [এ নিয়ামতের দরুন] তোমরা আমাকে স্মরণ কর اَذۡكُرۡكُمۡ আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব وَاشۡكُرُوۡا لِيۡ আর আমার শোকর কর وَلَا تَكۡفُرُوۡنِ এবং আমার না-শোকরি করো না।

(১৫৩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! اسۡتَعِيۡنُوۡا তোমরা আশ্রয় গ্রহণ কর بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

(১৫৪) وَلَا تَقُوۡلُوۡا আর এরূপ বলো না যে لِمَنۡ يُّقۡتَلُ যারা নিহত হয় فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে اَمۡوَاتٌ তারা মৃত بَلۡ اَحۡيَآءٌ বরং তারা জীবিত وَّلٰكِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

(১৫৫) আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা, আর উপবাস দ্বারা এবং ধনের ও প্রাণের ও ফল-শস্যের স্বল্পতা দ্বারা, আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে।

(১৫৬) যখন তাদের উপর কোনো মসিবত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

১৫৫. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা وَالْجُوْعِ আর উপবাস দ্বারা وَنَقْصٍ এবং স্বল্পতা দ্বারা مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ ধনের ও প্রাণের وَالثَّمَرٰتِ ও ফল-শস্যের وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে।

১৫৬. اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ যখন তাদের উপর মসিবত আসে قَالُوْٓا তখন বলে اِنَّا لِلّٰهِ আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৩) قوله وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ الخ **আয়াতের শানে নুযুল :** দ্বিতীয় হিজরিতে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে যে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলমানদের মাঝে আটজন আনসার ও ছয়জন মুহাজির মোট চৌদ্দজন সাহাবী মারা যান। তখন ইসলামের শত্রুরা বলাবলি করতে শুরু করে, যারা মুহাম্মদের কথায় এভাবে মারা গেল তারা কত দুর্ভাগা ও বোকা! অযথা ধর্মের নামে প্রাণ বিসর্জন দিল! আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, যারা দীনের জন্য এভাবে প্রাণ-বিসর্জন দেয়, তারা দুর্ভাগা নয়; বরং তারা বড়ই ভাগ্যবান এবং তারা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটি সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়তো যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। প্রথমবারের নির্দেশ" :

"অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফিরাবে।" এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাজে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ নিজের দেশে বা সফরে যেখানেই থাক না কেন, নামাজে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফিরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার বেলাতেই নয়; বরং যে কোনো স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামাজ পড়বে, তখন তারা মসজিদুল হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামাজ পড়বে।

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ অর্থাৎ, "যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন" কথাটা যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাজের সময় মসজিদুল হারমের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে এ কথা বলতে না পারে যে, তাওরাত এবং ইঞ্জিলে উল্লিখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু রাসূল ﷺ এ কা'বার পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা করে নামাজ পড়ছেন কেন?

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا শব্দটিতে وِجْهَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব– وِجْهَةٌ -এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তাফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই, প্রত্যেক জাতিরই ইবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোনো না কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোনো একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

كَمَا أَرْسَلْنَا –বাক্যে উদাহরণসূচক যে, ك (কাফ) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লিখিত তাফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হলো এই যে, 'কাফ' এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِي এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নিয়ামত হিসেবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর জিকিরও আরেকটি নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নিয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে كَمَا أَرْسَلْنَا এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের كَمَا أَخْرَجَنَا এবং সূরা হিজরের كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ এতে 'জিকির' এর অর্থ হলো স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'জিকির' বলা যায়। এতে বুঝা যায় যে, সে মৌখিক জিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনে মনেও আল্লাহর স্মরণ বিদ্যমান থাকবে।

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো লোক যদি মুখে তাসবীহ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ, জিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবূ উসমান (র.) এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে জিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনোই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, তবুও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ জিহ্বাকে তো অন্ততঃ তাঁর জিকিরে নিয়োজিত করেছেন। –[কুরতুবী]

জিকিরের ফজিলত : জিকিরের ফজিলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফজিলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। হযরত আবূ উসমান মাহদী (র.) বলেছেন যে, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনে কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

আর আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে ছওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।
হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র.) 'জিকরুল্লাহ'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে– "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর জিকিরই করে না; প্রকাশ্যে যত বেশি নামাজ এবং তাসবীহই সে পাঠ করুক না কেন।"

জিকিরের তাৎপর্য : মুফাসসির কুরতুবী ইবনে খোয়াইয (র.)-এর আহকামুল কুরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে, যদি তার নফল নামাজ রোজা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচারণ করে, সে নামাজ রোজা, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না।
হযরত যুন্নুনে মিসরী (র.) বলেন: "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"
হযরত মু'আয (রা.) বলেন, "আল্লাহর আজাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোনো আমলই জিকরুল্লাহর সমান নয়।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।

ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার : اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর," –এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি সালাত বা 'নামাজ'। বর্ণনারীতির মধ্যে। اسْتَعِيْنُوْا শব্দটিকে বিশেষ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামাজ। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর-এর তাৎপর্য : 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।
কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর' এর তিনটি শাখা রয়েছে। এক. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা। দুই. নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং তিন. যে কোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়, তবে তা 'সবর' -এর পরিপন্থি নয়। –[ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে]
'সবর'-এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দুটি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর' এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 'ইবনে কাসীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের অন্যত্র– اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে– এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

নামাজ : মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামাজ। 'সবর' এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নামাজ এমনই একটি ইবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা নামাজের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ

চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সে মতে নিজের 'নফস' এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর' এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাজের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ করার ব্যাপারে নামাজের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোনো কোনো ওষধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক; কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাজের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যেকোনো প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হুজুর ﷺ-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামাজ আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ তা'আলা সে নামাজের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ অর্থাৎ, মহনবী ﷺ-কে যখনই কোনো বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামাজ পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহর সান্নিধ্য : 'নামাজ' এবং 'সবরে'র মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাজি এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারো থাকে না। বলাবাহুল্য, মাকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত : ইসলামি রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আজাব বা ছওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন-প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন কাফের এবং পুণ্যবান ও গুনাগারের কোনো পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণির লোকই সমানভাবে শরিক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেক্কার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তাহলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোঁড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি বেশি তীক্ষ্ণ। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশি অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মরদেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টিত হয়, তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুর্নবিবাহ করতে পারে।

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশি মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম, আহকামে আর কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা, তাঁদের পরিত্যক্ত কোনো সম্পদ বণ্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তার পর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেক্কার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেক্কার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদায় বেশি।

যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে নষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোনো শহীদের লাশ যদি মাটির নিচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী রাসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী রাসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব দেহের মতো বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী রাসূলগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় এবং শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় বেশি শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রাসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোনো উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'– এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াকে তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমতঃ চিরকাল মরদেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশিদিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশিদিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ [তোমরা বুঝতে পার না,] বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের হয়নি।

বিপদে ধৈর্যধারণ : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার তাৎপর্য وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোনো বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানি অনেক বেশি হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেওয়া হবে; এছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করা : আয়াতে সবরকারীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম ছওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَكُوْنَنَّ : সীগাহ نهى حاضر معروف با نون ثقيلة বহছ واحد مذكر حاضر বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কখনো হয়ো না।

مُوَلِّيْهَا : সীগাহ اسم فاعل বহছ واحد مذكر বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মুখকারী।

اسْتَبِقُوا : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَاقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অগ্রসর হও, প্রতিযোগিতা কর।

يَأْتِ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– সে আসে।

حُجَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حجج অর্থ– দলিল, প্রমাণ।

تَهْتَدُوْنَ : সীগাহ مضارع معروف বহছ جمع مذكر غائب বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা রাস্তা পাও, পাবে।

يُزَكِّي : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْكِيَةُ মূলবর্ণ– (ز ـ ك ـ و) অর্থ– তিনি পবিত্র করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ الخ : আলোচ্য আয়াতাংশে حُجَّةٌ হচ্ছে يَكُوْنَ-এর ইসম ও لِلنَّاسِ হলো جار ও مجرور মিলে তার খবর।

اَمْوَاتٌ : শব্দটি خبر হয়েছে। আর তার مبتدأ হলো উহ্য هُمْ এবং اَحْيَاءٌ শব্দটিও خبر হয়েছে, তার مبتدأ হলো উহ্য هم এবং اَمْوَاتٌ ও اَحْيَاءٌ কে لَا تَقُوْلُوْا-এর معمول বানানো সহীহ নয়।

قوله وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الخ : আয়াতটিতে لَنَبْلُوَنَّ ফে'ল উহ্য যমীর نَحْنُ হলো فاعل ও كم হলো مفعول আর بِشَيْئٍ টি جار ও مجرور মিলে উহ্য ثابت-এর সাথে متعلق কিন্তু مِنَ الْخَوْفِ টি جار ও مجرور মিলে فعل-এর متعلق হয়েছে। نَقْصٌ-এর সাথে مجرور ও جار টি مِنَ الْاَمْوَالِ الخ আর পরবর্তী صفة-এর شَيْئٍ শব্দটি ثَابِتٌ متعلق হয়েছে। অতঃপর فعل তার فاعل, مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৫৭) তাদের প্রতি [বর্ষিত] হবে বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা [তত্ত্বজ্ঞানে] পৌঁছেছে।	اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ (۱۵۷)
(১৫৮) নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর স্মৃতি-নিদর্শনের অর্ন্তভুক্ত, অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করে কিংবা ওমরা করে, তার কোনোই গুনাহ নেই, যাতায়াত করতে- এতদুভয়ের মধ্যে, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো নেক কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সমুচিত মূল্য প্রদান করেন, খুব ভালোরূপে জানেন।	اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (۱۵۸)
(১৫৯) নিশ্চয়, যারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলোকে যা উজ্জ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐগুলোকে সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে প্রকাশ করে দেওয়ার পর, তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহও, আর লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ (۱۵۹)
(১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, আর ব্যক্ত করে দেয়, তবে তাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি, আর আমি তো তওবা কবুল করায় এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যস্ত।	اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (۱٦۰)

শাব্দিক অনুবাদ

১৫৭. اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ তাদের প্রতি [বর্ষিত] হবে صَلَوٰتٌ বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ مِّنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে وَرَحْمَةٌ এবং সাধারণ করুণাও وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ আর এরাই এমন লোক যারা [তত্ত্বজ্ঞানে] পৌঁছেছে।

১৫৮. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ আল্লাহর স্মৃতি-নিদর্শনের অর্ন্তভুক্ত فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করে اَوِ اعْتَمَرَ কিংবা ওমরা করে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ তার কোনোই গুনাহ নেই اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا যাতায়াত করতে- এতদুভয়ের মধ্যে وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো নেক কাজ করে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা شَاكِرٌ সমুচিত মূল্য প্রদান করেন عَلِيْمٌ খুব ভালোরূপে জানেন।

১৫৯. اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ নিশ্চয়, যারা গোপন করে مَآ اَنْزَلْنَا আমার অবতারিত বিষয়গুলোকে مِنَ الْبَيِّنٰتِ যা উজ্জ্বল وَالْهُدٰى ও সুপথ প্রদর্শনকারী مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ আমি ঐগুলোকে প্রকাশ করে দেওয়ার পর لِلنَّاسِ সর্বসাধারণের জন্য فِى الْكِتٰبِ কিতাবে اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহও وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ আর লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন।

১৬০. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কিন্তু যারা তওবা করে وَاَصْلَحُوْا এবং সংশোধন করে নেয় وَبَيَّنُوْا আর ব্যক্ত করে দেয় فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ তবে তাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি وَاَنَا আর আমি তো খুবই অভ্যস্ত التَّوَّابُ তওবা কবুল করায় الرَّحِيْمُ এবং অনুগ্রহ করায়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ (١٦١)

অনুবাদ : (১৬১) অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করে না এবং এ কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের প্রতি লা'নত আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং মানবেরও [অর্থাৎ উভয় কুলের লানতকারীরও]।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ (١٦٢)

(১৬২) তারা অনন্তকাল তাতেই থাকবে, তাদের না আজাব হালকা হবে, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۟ (١٦٣)

(১৬৩) আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য তিনি তো একই মা'বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য কানো মা'বুদ নেই, পরম দয়ালু করুণাময়।

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (١٦٤)

(১৬৪) নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির আগমনে এবং জাহাজসমূহে যা সমুদ্রে চলাচল করে মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে, আর পানিতে যা আল্লাহ আসমান হতে বর্ষণ করেন। অতঃপর সরস সতেজ করেন তা দ্বারা জমিনকে তা অনুর্বর হওয়ার পর, আর সর্বপ্রকারের জীবজন্তু তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর বায়ুরাশির পরিবর্তনে এবং মেঘমালায়– যা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে, প্রমাণসমূহ আছে সেই লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করে না وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ এবং এ কাফের অবস্থায় মারা যায় اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ তাদের প্রতি লা'নত আল্লাহর وَالْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এবং মানবেরও [অর্থাৎ উভয় কুলের লানতকারীরও]।

(১৬২) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা অনন্তকাল তাতেই থাকবে لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ তাদের না আজাব হালকা হবে وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।

(১৬৩) وَاِلٰهُكُمْ আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তিনি তো একই মা'বুদ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত অন্য কানো মা'বুদ নেই الرَّحْمٰنُ পরম দয়ালু الرَّحِيْمُ করুণাময়।

(১৬৪) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃজনে وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির আগমনে وَالْفُلْكِ এবং জাহাজসমূহে الَّتِيْ تَجْرِيْ যা চলাচল করে فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আর যা আল্লাহ বর্ষণ করেন مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مِنْ مَّآءٍ পানিতে فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ অতঃপর সরস সতেজ করেন তা দ্বারা জমিনকে بَعْدَ مَوْتِهَا তা অনুর্বর হওয়ার পর وَبَثَّ فِيْهَا আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ সর্বপ্রকারের জীবজন্তু وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ আর বায়ুরাশির পরিবর্তনে وَالسَّحَابِ এবং মেঘমালায়– الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ যা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে لَاٰيٰتٍ প্রমাণসমূহ আছে لِّقَوْمٍ সেই লোকদের জন্য يَّعْقِلُوْنَ যারা জ্ঞান রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৮) قوله اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সাফা ও মারওয়া কা'বা ঘরের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে হযরত হাজেরা (আ.) পানি অন্বেষণে দৌড়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ দৌড়ানোকে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত বার প্রদক্ষিণ করাকে হজ ও ওমরার অংশ নির্ধারণ করে দেন। জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার মুশরিকরা সাফা পাহাড়ের চূড়ায় 'ইসাফ' নামের এক নরমূর্তি ও মারওয়ার পাহাড়ের চূড়ায় 'নায়েলা' নামের এক নারীমূর্তি স্থাপন করে তারা নিজস্ব নিয়মে হজ পালনকালে সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করত এবং পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করত চুম্বন করত এবং এগুলোর পাশে দোয়া করত। তাই ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ দু'টি পাহাড়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করাকে গর্হিত ও পরিত্যাজ্য হওয়ার ধারণা করেন। তাদের এ ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

(১৫৯) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার সাহাবায়ে কেরামের এক দল ইহুদি পণ্ডিতের নিকট তাওরাতের কয়েকটি বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা যথাযথ উত্তর প্রদান করেনি। ইহুদিদের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়েছিলেন তারা এবং মুসলমানদের মধ্য হতে যারা তাওরাত পড়তে পারতেন তারা এ ভুল ধরিয়ে দিতে সক্ষম হন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাওরাতে বর্ণিত থাকলেও তারা নবীর আত্মপ্রকাশের পর তা রদবদল করে বর্ণনা করতে শুরু করে। অথচ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, আমি তাওরাতে বর্ণিত আলামতের দ্বারা নবীজীকে সঠিকভাবে চিনে নিতে সক্ষম হই, এমনকি আমি আমার ছেলেকে চেনার চেয়েও তাঁকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারি।

ইহুদিদের মধ্যে বিবাহিত নর ও নারী ব্যভিচারে ধরা পড়ে। ইহুদিরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি তাওরাতের শাস্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দেন। তাওরাতে এর শাস্তি কুরআনের বিধানের অনুরূপ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন। তারা কিতাব এনে বিধান লেখা স্থানটি হাতে ঢেকে পড়তে শুরু করে এবং অন্য বিধান বর্ণনা করার প্রয়াস চালায়। তখন উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে যারা তাওরাত পড়া জানতেন তারা হাতে ঢাকা স্থান হতে হাত সরিয়ে পড়তে বললেন। এমতাবস্থায় তারা তাওরাতের বিধান গোপন রাখতে ব্যর্থ হলো।

উল্লিখিত সবগুলো ঘটনাই এ আয়াতসমূহের শানে নুযূল হতে পারে।

(১৬৪) قوله اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যখন পূর্ববর্তী আয়াত وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ নাজিল করা হয়, তখন কাফেররা বলতে শুরু করে, এত বিশাল ব্রাহ্মণ্ডের জন্য এক ইলাহ, কিভাবে তা সম্ভব? নিশ্চয় আরো ইলাহ রয়েছে। তখন মহান আল্লাহ ক্ষমতায় সার্বভৌমত্ব ও একত্ব প্রকাশ করতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

কুরাইশরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিদর্শন দাবি করত। তারা বলত, যদি এই কাজটি করতে পারেন, তাহলে করে দেখান। কিন্তু তা দেখানোর পর তারা সেটিকে জাদু বা ইত্যাকার কোনো শব্দ দ্বারা বিশেষিত করত, কিন্তু ঈমান আনত না। যেমন একবার এক কুরইশী যুবক এসে নবীজীকে বলে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণের দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারেন তাহলে আমাদের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। তখন আমরা আপনাকে নবী মেনে নিতে কোনো দ্বিধা করব না। শুনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট এই মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আদায় করলেন। এরপর নবীজীর দোয়ার প্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে হুজুরের সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, আপনার পক্ষ থেকে এ মু'জিযা দেখাবার পরও তারা ঈমান আনবে না। আর আল্লাহর নিয়ম হলো মু'জিযা দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তাহলে তিনি কাফেরদের নির্মূল করে দেন। সেই নিয়মে তিনি আপনার উম্মতকেও নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এ কথা শুনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁপে উঠলেন এবং বললেন, "তাদের কাঙ্ক্ষিত মু'জিযা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আমি দাওয়াত দিতে থাকব, হয়তো তাতেই তারা ঈমান আনতে থাকবে।' তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তাতে আল্লাহর নিদর্শন হিসাবে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, সত্যান্বেষীদের জন্য তাই কি কম? তাই কি যথেষ্ট নয়? অবশ্যই যথেষ্ট ও অধিক। –[ইবনে কাসীর]

قوله شَعَآئِرِ اللهِ **-এর অর্থ :** شَعَآئِر শব্দটি شَعِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ চিহ্ন ও নিদর্শন। شَعَآئِرِ اللّٰهِ বলতে সেই সব কাজ কর্ম ও ইবাদতকে বুঝায় যে গুলোকে আল্লাহ তা'আলা দীনের নির্দশন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর নির্দেশিত সকল নিদর্শন, যেমন আযান, জামাতে নামাজ আদায় করা ইত্যাদি এবং ইবাদতের সকল স্থান যেমন কা'বাঘর, আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার প্রান্তর ইত্যাদিকে شَعَآئِرِ اللّٰهِ বলে।

عُمْرَة ও حَجّ-এর অর্থ : حَجّ -এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা ও সংকল্প গ্রহণ করা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় زِيَارَةُ بَيْتِ اللّٰهِ فِىْ وَقْتِ الْحَجِّ مَعَ اَدَاءِ الْوَاجِبِ بِالطَّرِيْقَةِ الْمَسْنُوْنَةِ ইবাদতের সংকল্প গ্রহণ করে মক্কা নগরীতে গমন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে বিশেষ ধরনের কয়েকটি কার্য সম্পাদন করাকে হজ বলে।

عُمْرَة -এর আভিধানিক অর্থ : জিয়ারত করা, আবাদ করা বা দর্শন করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কা'বা ঘর তওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা এবং এগুলো করার জন্য ইহরাম বাঁধাকে ওমরা বলে। ওমরার শেষে হজের ন্যায় মাথা কামাতে হয়।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ বলার কারণ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ কথাটি সন্দেহভাজন করতে এভাবে বলা হয়েছে। নয়তো কাজটি পূর্ণতাই ছওয়াবের এবং ইবাদত হিসেবে হজ ও ওমরার অংশ। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে হজের যাবতীয় বিধান শিক্ষা দেন। তম্মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ (প্রদক্ষিণ) করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু জাহেলী যুগে মক্কার মুশরিকরা সাফা ও মারওয়ার শীর্ষদেশে ইসাফ ও নায়েলা নামের দু'টি প্রতিমা স্থাপন করে এবং সা'ঈ করার সময় এই গুলোকে তারা সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে ইসলামের প্রথমযুগে মুসলমানদের সন্দেহ জাগে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা সম্ভবত অনৈসলামিক কাজ এবং তাতে নিশ্চয় ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এ সন্দেহ দূর করার জন্য এ আয়াত নাজিল করেন যে, সা'ঈ করায় কোনো গুনাহ হবে না।

সা'ঈর হুকুম : সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর মতে সুন্নত। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ফরজ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াজিব।

হজ ও ওমরার ফরজ ও ওয়াজিব : হজের ফরজ তিনটি যথা–(১) ইহরাম বাঁধা, (২) যিলহজের নয় তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান ও (৩) তওয়াফে জিয়ারত।

হজের ওয়াজিব পাঁচটি যথা–[১] মুযদালিফায় অবস্থান [২] তওয়াফে জিয়ারতের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা (প্রদক্ষিণ) [৩] কঙ্কর নিক্ষেপ করা, [৪] মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তওয়াফে বিদা এবং [৫] মাথা কামানোর মাধ্যমে ইহরাম ভঙ্গ করা।

ওমরার ফরজ দু'টি যথা–(১) ইহরাম বাঁধা ও (২) কা'বাঘর তওয়াফ করা।

ওমরার ওয়াজিব তিনটি যথা (১) তওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের নিকটে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা। (২) সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার প্রদক্ষিণ করা এবং (৩) মাথা কামিয়ে ইহরাম ভঙ্গ করা।

হজ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য : হজ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য হলো– (১) হজ ফরজ, কিন্তু ওমরাহ ফরজ নয়। (২) হজ বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে আদায় করতে হয়, কিন্তু ওমরাহ যিলহজের পাঁচ দিন (৯ হতে ১৩ তারিখ) ব্যতীত অন্য যে কোনো দিন আদায় করা যায়।

(৩) ওমরার তুলনায় হজের কাজ অনেক বেশি, ওমরা হতে তওয়াফ ও সা'ঈ করতে হয় হজে এগুলো ছাড়াও আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানি ইত্যাদি কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়।

হজের حُكْم ও তার দলিল : হজ মানব জীবনে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে একবার ফরজ। চাই পুরুষ হোক আর মহিলা হোক। এটা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত সত্য। কুরআন যেমন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا হাদীস যেমন– بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ .... الخ আর ইজমা যেমন–সকল ওলামায়ে উম্মত হজকে ফরজ হিসেবে মেনে নিয়েছেন, কেউ এর বিরোধিতা করেননি।

সাফা-মারওয়ার প্রদক্ষিণের হুকুম : ফিক্‌হবিদগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। যেমন– (১) ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের (র.) একটি মত হলো– এটা হজের রোকন যে সা'ঈ বাদ দেবে তার হজ হবে না।

(২) ইমাম আযম (র.)-এর মতে সা'ঈ ওয়াজিব; রোকন নয়, কেউ যদি বাদ দেয় তাহলে دَمٌ ওয়াজিব হবে।

(৩) ইমাম আহমদের দ্বিতীয় মত হলো–এটা সুন্নত, বাদ পড়লে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

উভয় পক্ষের দলিল : প্রথম পক্ষ নবী করীম ﷺ-এর হাদীস اِسْعَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ -কে দলিল হিসেবে পেশ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ সা'ঈ করলে কোনো গুনাহ নেই। গুনাহ রহিত করার দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা রোকন নয়। তবে নবী কারীম ﷺ অন্যান্য কাজের মতো তা আদায় করেছেন বিধায় وَاجِبٌ বলা যায়। তৃতীয় পক্ষ দলিল হিসেবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ تَطَوَّعَ বলেছেন, ওয়াজিব বলেননি।

হজের শর্তসমূহ : হজ কিছু শর্তসাপেক্ষে জীবনে একবার ফরজ। এ শর্তগুলোর অনুপস্থিতে হজ ফরজ হবে না। চাই সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ– (১) মুসলমান (২) বালেগ (৩) বুদ্ধিমান (৪) স্বাধীন হওয়া (৫) রাস্তা নিরাপদ থাকা (৬) اِسْتِطَاعَتْ তথা সক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা ইত্যাদি।

ইলমে দীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর, সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় :

প্রথমতঃ যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরি, তা গোপন করা হারাম। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'যে লোক দীনের কোনো বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।' হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা ও আমর ইবনে আস (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও। –[কুরতুবী, জাস্সাস]

দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, 'জ্ঞানকে গোপনা করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সুক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যা দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كِتْمَانِ عِلْمٍ বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লিখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমন সব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদেরই সম্মুখীন করবে।–[কুরতুবী]

সহীহ বুখারীতে হযরত আলী (রা.) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যেকথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে।

কোন কোন পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে : وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ –আয়াতে কুরআনে কারীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (রা.) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনিক জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতিসাধিত হয়। হযরত বা'রা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, اللّٰعِنُوْنَ -এর অর্থ হলো সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত প্রাণী। –[কুরতুবী]

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয় যতক্ষণ না তার কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় : وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ –বাক্যাংশের দ্বারা জাস্‌সাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করেছেন যে, যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির [মৃত্যুর] নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো উপায় নেই, সেহেতু কোনো কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েজ নয়। বস্তুতঃ রাসূলে কারীম ﷺ যে সমস্ত কাফেরের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েজ।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোনো মুসলমান কিংবা কোনো জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসূর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাজেই কাউকে 'মরদুদ', 'আল্লাহর অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেওয়াই লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থি আয়াত وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন আলোচ্য আয়াতে।

তাওহীদের মর্মার্থ : وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোনো সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত : উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ, তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত : সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ, অংশী বিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত : তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনো বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোনো কিছুই ছিল না এবং তখনো বিদ্যমান থাকবেন যখন কোনো কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে وَاحِدٌ বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِدٌ শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে। –[জাসসাস]

তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি চলতে পারতো না; তেমনি এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কুরআনে হাকীমে এভাবে উল্লেখ করেছে : اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ অর্থাৎ, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে যাবে।"

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ : শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানি রফতানি করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনভিাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনোকিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোনো মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন মতো ছ' মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনোক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ অর্থাৎ, "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাল-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফলগুধারা সমগ্র জমিনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনোখানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَجَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَجُّ মূলবর্ণ (ح ـ ج ـ ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ইচ্ছা করা, হজ করা।

اِعْتَمَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِمَارُ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে ওমরা করে।

يَطَّوَّفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّفُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে তওয়াফ করে।

تَطَوَّعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে নফল আমল করে।

يَلْعَنُ : সীগাহ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَللَّعْنُ মূলবর্ণ (ل ـ ع ـ ن) জিনসে صحيح অর্থ– সে লা'নত করে।

بَيَّنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা বর্ণনা করেছে।

اَتُوْبُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি তওবা কবুল করি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ : বাক্যটিতে اَلصَّفَا ও اَلْمَرْوَةَ শব্দ দু'টি اِنَّ এর اسم আর مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ টি جار ও مجرور মিলে اِنَّ এর خبر পরবর্তী বাক্য فَمَنْ حَجَّ الخ শর্ত ও فَلَا جُنَاحَ الخ তার জবাব। তার পরবর্তী বাক্যে مَنْ تَطَوَّعَ টি শর্ত ও فَاِنَّ اللّٰهَ হলো جزاء বিধায় উভয় বাক্যের উপর فاء جزائية এসেছে।

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الخ : এখানে اِنَّ হচ্ছে حرف مشبهة بالفعل আর اَلَّذِيْنَ মওসুল يَكْتُمُوْنَ ফে'ল, যমীর هم ফা'য়েল, مَا اَنْزَلْنَا বাক্যটি يَكْتُمُوْنَ এর মাফউল مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى বয়ান مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا মুতা'আল্লাক হলো يَكْتُمُوْنَ-এর সাথে। এ সমস্ত মিলিত হয়ে صلة। صلة ও موصول মিলিত হয়ে ইসমে اِنَّ হলো اُولٰٓئِكَ মুবতাদা يَلْعَنُهُمُ الخ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলিত হয়ে খবরে ان

قوله اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا الخ : এখানে يَلْعَنُهُمْ-এর যমীর هم নসবের স্থলে অবস্থিত مستثنى متصل হলো مستثنى منه এবং اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ ইসমে اِنَّ আর اُولٰٓئِكَ মুবতাদা عَلَيْهِمْ খবরে মুকাদ্দাম لَعْنَةُ اللّٰهِ মুবতাদা, মুবতাদা খবর মিলিত হয়ে খবরে اِنَّ হয়েছে وَهُمْ كُفَّارٌ হাল।

خٰلِدِيْنَ : হাল হলো عَلَيْهِمْ এর যমীর হতে لَا يُخَفَّفُ হাল হলো خٰلِدِيْنَ এর যমীর হতে اِلٰهُكُمْ-এর মধ্যে اِلٰهٌ খবর وَاحِدٌ তার সিফাত।

قوله اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الخ এর খবর এবং لَاٰيٰتٍ হলো ইসম يَعْقِلُوْنَ বাক্য হয়ে قَوْمٍ-এর সিফাত।

অনুবাদ (১৬৫) আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেও অংশী সাব্যস্ত করে, তাদেরকেও এমনভাবে ভালোবাসে, যেমন ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গে হওয়া আবশ্যক, আর যারা মুমিন তাদের ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে; আর কতই না ভালো হতো যদি এই জালিমরা যখন কোনো বিপদ দেখে তখন এটা বুঝত যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, আর আল্লাহর আজাব কঠোর হবে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (١٦٥)
(১৬৬) যখন মাতাব্বরগণ তাবেদারগণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে এবং সকলেই আজাব প্রত্যক্ষ্য করবে এবং তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।	اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ
(১৬৭) আর এই তাবেদারগণ বলবে, যদি আমরা একটু [দুনিয়ায়] ফিরে যেতে পারতাম, তবে আমরাও তাদের হতে সম্পূর্ণ পৃথক হতাম যেমন [আজ] তারা আমাদের হতে পরিষ্কার পৃথক হয়ে পড়েছে; আল্লাহ এরূপেই তাদেরকে তাদের কুকর্মগুলো নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষারূপে দেখিয়ে দিবেন। আর তাদের দোজখ হতে বের হওয়া কখনো নছীবে ঘটবে না।	وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (١٦٧)
(১৬৮) হে মানব! যা জমিনে রয়েছে তা হতে হালাল পবিত্র জিনিসগুলো খাও, আর শয়তানের অনুসরণ করো না, বাস্তবিক সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖؗ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (١٦٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৫) وَمِنَ النَّاسِ আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে مَنْ يَّتَّخِذُ যে সাব্যস্ত করে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেও اَنْدَادًا অংশী يُّحِبُّوْنَهُمْ তাদেরকেও এমনভাবে ভালোবাসে كَحُبِّ اللّٰهِ যেমন ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গে হওয়া আবশ্যক وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا আর যারা মুমিন اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ তাদের ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا আর কতই না ভালো হতো যদি এই জালিমরা এটা বুঝত যে اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ যখন কোনো বিপদ দেখে তখন اَنَّ الْقُوَّةَ সমস্ত ক্ষমতা لِلّٰهِ আল্লাহরই وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ আর আল্লাহর আজাব কঠোর হবে।

(১৬৬) اِذْ تَبَرَّاَ যখন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا মাতাব্বরগণ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا তাবেদারগণ হতে وَرَاَوُا الْعَذَابَ এবং সকলেই আজাব প্রত্যক্ষ্য করবে وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ এবং তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

(১৬৭) وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا আর এই তাবেদারগণ বলবে لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً যদি আমরা একটু [দুনিয়ায়] ফিরে যেতে পারতাম فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ তবে আমরাও তাদের হতে সম্পূর্ণ পৃথক হতাম كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا যেমন [আজ] তারা আমাদের হতে পরিষ্কার পৃথক হয়ে পড়েছে كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ আল্লাহ এরূপেই তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন اَعْمَالَهُمْ তাদের কুকর্মগুলো حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষারূপে وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ আর তাদের বের হওয়া কখনো নছীবে ঘটবে না مِنَ النَّارِ দোজখ হতে।

(১৬৮) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! كُلُوْا খাও مِمَّا فِى الْاَرْضِ যা জমিনে রয়েছে حَلٰلًا طَيِّبًا হালাল পবিত্র জিনিসগুলো। وَلَا تَتَّبِعُوْا আর অনুসরণ করো না خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ শয়তানের اِنَّهٗ لَكُمْ বাস্তবিক সে তোমাদের عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ প্রকাশ্য শত্রু।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৬৯) সে তো তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দিবে যা মন্দ ও অশ্লীল, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি কর যার কোনো প্রমাণই তোমাদের নিকট নেই।	إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (١٦٩)
(১৭০) আর যখন কেউ তাদেরকে বলে, আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল, তখন তারা বলে, বরং আমরা তাতেই [ঐ পথেই] চলব যাতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি, যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কোনো জ্ঞানই রাখত না এবং কোনো হেদায়েতপ্রাপ্তও ছিল না [তবুও?]।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ (١٧٠)
(১৭১) আর এ কাফেরদের অবস্থা সেই [জন্তুর] অবস্থার অনুরূপ যে, কেউ এরূপ জন্তুর পিছনে চিৎকার করছে, যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না, এই কাফেররা বধির, বোবা ও অন্ধ, সুতরাং কিছুই বুঝে না।	وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٧١)
(১৭২) হে মুমিনগণ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে খাও, আর আল্লাহর শোকরগুজারী কর যদি তোমরা খাছ তাঁরই সঙ্গে গোলামীর সম্পর্ক রেখে থাক।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (١٧٢)

শাব্দিক অনুবাদ

১৬৯. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ সে তো তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দিবে যা بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ মন্দ ও অশ্লীল وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি কর مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যার কোনো প্রমাণই তোমাদের নিকট নেই।

১৭০. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ আর যখন কেউ তাদেরকে বলে اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল قَالُوْا তখন তারা বলে بَلْ نَتَّبِعُ বরং আমরা তাতেই [ঐ পথেই] চলব مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا রাখত না কোনো জ্ঞানই وَّلَا يَهْتَدُوْنَ এবং কোনো হেদায়েতপ্রাপ্তও ছিল না [তবুও?]।

১৭১. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেরদের অবস্থা كَمَثَلِ الَّذِىْ সেই [জন্তুর] অবস্থার অনুরূপ যে يَنْعِقُ কেউ এরূপ জন্তুর পিছনে চিৎকার করছে لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না صُمٌّۢ এই কাফেররা বধির بُكْمٌ বোবা ও عُمْىٌ ও অন্ধ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না।

১৭২. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُلُوْا খাও مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ আর আল্লাহর শোকরগুজারী কর اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ যদি তোমরা খাছ তাঁরই সঙ্গে গোলামীর সম্পর্ক রেখে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৮) قوله يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জারীর হতে বর্ণিত। এই সমস্ত আয়াত ছকীফ, খাযা'য়া, আমের ইবনে ছা'ছা' ও অন্যান্য আরব কাফেরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ষাঁড় ও অন্যান্যের মাংস হারাম মনে করত। –[ইবনে জারীর, রূহুল মা'আনী]

অথবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং কয়েককজন নওমুসলিম সাহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলমান হওয়ার পরও উটের গোশ্‌ত নিজেদের উপর হারাম মনে করত। কেননা ইহুদি ধর্মে তা হারাম ছিল। তাদের প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

অথবা, যে সমস্ত লোক খেজুর, পনির ইত্যাদি সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী নিজেদের উপর হারাম করেছিল, তাদের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

(১৭০) قوله وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদের প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবান জানালে, ইহুদিদের মধ্য হতে রাফে' ইবনে হারমালা এবং মালেক ইবনে আউফ বলল, আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদের পথেই চলব, তাদের পথ আমরা কখনো ছাড়তে পারব না। তাদের প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে তাদের পিতৃ পুরুষদের অবৈধ রীতি-নীতি ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহবান জানালে তারা তা প্রত্যাখান করে এবং বলে, আমরা ঐ পথেই চলব, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাগণ চলতেন, তখন তাদের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বায়যাবী]

اَنْدَادًا -এর অর্থ : اَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ-এর বহুবচন। نِدٌّ অর্থ সমকক্ষ, সমপর্যায় বা শরিক। আয়াতে اَنْدَادًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়–(১) ঐ সকল মূর্তি ও অবতার যেগুলোকে মুশরিকরা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য মাধ্যম বলে ধারণা করত, তাদের পূজা-অর্চনা করত এবং তাদের পক্ষ থেকে ভালো-মন্দ প্রাপ্তির ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখত। অধিকাংশ মুফাসসিরদের এটিই অভিমত। (২) ঐ সকল নেতা, পণ্ডিত ও পুরোহিত, মুশরিক ও কাফেররা যাদের অনুসরণ করে, যারা নিজ মর্জি মাফিক হুকুম-আহকাম প্রচার করে এবং বলে বেড়ায় যে, এগুলোই ধর্মীয় বিধান ও ঐশী নির্দেশ। আর এভাবেই তারা পার্থিব কিছু সম্পদ ও সম্মান অর্জন করে থাকে এটি আল্লামা সুদ্দীর অভিমত। (৩) সুফীদের মতে, যা কিছু মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে তাই نِدٌّ -

قوله يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ -এর মর্মার্থ : আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ– আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালোবাসে। কাফের মুশরিকরা ইলাহ হিসেবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেগুলোকে গ্রহণ করে তাদের প্রতি তারা কতটুকু ভালোবাসা পোষণ করে, আয়াতাংশে তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কতক লোক দ্বারা মুশরিকদের বিবরণ দেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে, তারা আল্লাহকে যতটুকু ভালোবাসে অন্য দেব-দেবীকেও ঠিক ততটুকুই ভালোবাসে। কিন্তু যদি কতক লোক দ্বারা কাফের ও নাস্তিক সমাজের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন হয়, কাফের ও নাস্তিকরা তো আল্লাহকে স্বীকারই করে না, তাই আল্লাহকে ভালোবাসার কথাও তো এখানে অসামঞ্জস্য। তখন তার উত্তরে বলা হয়ঃ (১) হয়তো আয়াতাংশের অর্থ– كَحُبِّ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلّٰهِ মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার সমতুল্য তাদের দেব-দেবীর প্রতি ভালোবাসা। অথবা, (২) আয়াতাংশের অর্থ, كَالْحُبِّ اللَّازِمِ عَلَيْهِمْ لِلّٰهِ আল্লাহর প্রতি তাদের যে পরিমাণ ভালোবাসা থাকা সমুচিত সে পরিমাণ ভালোবাসা তারা দেব-দেবীর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে।

قوله وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ الخ -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা মু'মিনেদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলছেন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তারা আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে তা জাগতিক অন্য সকল ভালবাসা থেকে দৃঢ়তম।

এ আয়াতাংশের অর্থ হতে পারে– মু'মিনগণ অন্য সকল কিছুর প্রতি যে পরিমাণ আন্তরিক আকর্ষণ ও ভালোবাসা পোষণ করে যেমন স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি তার তুলনায় আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণ করে।

অথবা, আয়াতাংশের অর্থ– অমুসলিম সমাজ নিজ নিজ মনগড়া দেব-দেবী বা নাস্তিক তার নিজ নিজ মনপ্রভুকে যতটুকু ভালোবাসে মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহকে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ ভালবাসে। অমুসলিমদের বিপরীতে মু'মিনদের এই বিবরণই এখানে অধিক সঙ্গত, তাই ওলামায়ে কেরাম এ অর্থটিকেই অধিক পছন্দ করেছেন।

অমুসলিমদের দেব-দেবীর প্রতি বা নেতা, পুরোহিতের প্রতি ভালোবাসা অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে, অনেক সময় আন্তরিক হলেও তা বিপদাপদের মুহূর্তে উঠে যায়। অপরদিকে মুসলমানদের বিপদাপদে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর প্রেমে সে এতটুকু আত্মহারা থাকে যে, আল্লাহর শত্রুর সাথে মোকাবিলায় নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতেও তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।

قوله وَلَوْ يَرَى -এর رُؤْيَة -এর মর্মার্থ : وَلَوْ يَرَى -এর رُؤْيَة কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. رُؤْيَة অর্থ দেখা ও প্রত্যক্ষ করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে– যদি জালিম সম্প্রদায় দুনিয়ায় থাকাকালেই আখেরাতের আজাব প্রত্যক্ষ করত তখন বুঝতে পারত যে সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

২. رُؤْيَة অর্থ জানা। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে– যদি জালিম সম্প্রদায় দুনিয়ায় থাকা কালেই আখেরাতের আজাব সম্পর্কে জানত, তাহলে তারা বুঝতে পারত।

قوله تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ -এর মর্মার্থ : এই আয়াতাংশের অর্থ– তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু কিয়ামত ও তার পরবর্তী জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থানের যাবতীয় অবস্থা অবশ্যই ঘটবে, তাই এ সকল অবস্থা বর্ণনায় مَاضِىْ -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেন অতীতের ন্যায় এগুলো ঘটে গেছে তাই সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষের একে অপরের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, নতুবা বন্ধুত্বের। এক কামনা বা একই পেশাভুক্ত হওয়ার কারণে এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিন্তু কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে সেদিন সকল সম্পর্কই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একে অপরের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্কের কথাই স্বীকার করবে না। কারণ এ কথাই অপর এক আয়াতে এভাবে বিবৃত হয়েছে– يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ –যেদিন লোক তার ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তান থেকে পালাতে থাকবে। অথচ বন্ধুত্বের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কই থাকে দৃঢ়তর। তাই যেদিন আত্মীয়তাই বহাল থাকবে না। সেদিন বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো প্রকাশিতই হবে না।

قوله فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ -এর মর্মার্থ : মুশরিক ও ভণ্ড নেতাদের অনুসারীরা বলবে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে তারা আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণ অনুসরণ করত এবং অনুসৃতদের নিকট থেকে দূরে থাকত। মোদ্দাকথা, এগুলো দ্বারা তাদের আফসোসের মাত্রাই বৃদ্ধি পাবে, কোনো ফায়দা হবে না। –[রুহুল মা'আনী]

قوله كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا দ্বারা উদ্দেশ্য : ভ্রান্ত নেতা ও সমাজপ্রধান এবং তাদের অনুসারীদের পরিণতির কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ যেভাবে ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়ে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, মুসলমানদেরকে তা হতে সতর্ক করে দেওয়া এবং নেতা ও কর্তাদের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। যেন তারা আল্লাহর দুশমন নেতাদের পশ্চাতে চলতে কোনো সময়ই প্রস্তুত না হয়।

لَوْ -এর জবাব : وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ বাক্যে يَرَى ফে'ল, الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ -ফায়েল, অতঃপর বাক্যটি শর্ত আর শর্তের জবাব উহ্য। অর্থাৎ لَعَلِمُوْا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ

শব্দ বিশ্লেষণ : حَلَالًا طَيِّبًا - حَلَّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিঠ খোলা। যেসব বস্তু সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল– ১. হালাল খাওয়া, ২. ফরজ আদায় করা এবং ৩. রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طَيِّبٌ শব্দের অর্থ পবিত্র। শরিয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خُطُوَاتٌ [খুতুওয়াত] خُطْوَةٌ [খুতওয়াতুন]-এর বহুবচন। خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ এর অর্থ হচ্ছে শয়তানি কাজকর্ম।

بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ – سُوْء বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فَحْشَاء অর্থ– অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سُوْء এবং فَحْشَاء-এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ, সাধারন গুনাহ এবং কবিরা গুনাহ। اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ এখানে শয়তানের নির্দেশ দান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আদম-সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানি প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানি ওয়াসওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের এলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এবং لَا يَهْتَدُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোনো খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বুঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যা শরিয়তের প্রকৃষ্ট 'নছ' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কোনো বিধি বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোনো আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে ইজতেহাদ [উদ্ভাবন]-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েজ। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়; বরং আল্লাহর এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যই তা হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহর সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোনো মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণের এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য : উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আ.)–এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে –

–'আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর ধর্মবিশ্বাসের।'

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েজ; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ : আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অস্বচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খানায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তা দ্বারা অন্যায় অস্বচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন যে– يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا '(হে আমার রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর)।'

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার ত'শা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার! ইয়া রব!।' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? –[মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে কাছীর-এর বরাতে]

শব্দ বিশ্লেষণ

بَثَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَثُّ মূলবর্ণ (ب . ث . ث) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ছড়িয়েছে।

يُحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বন্ধু মনে করে, ভালোবাসে।

اتُّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– যাদের অনুসরণ করা হয়েছে।

وَتَقَطَّعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّقَطُّعُ মূলবর্ণ (ق . ط . ع) জিনস صحيح অর্থ– সে ছিন্ন হয়ে গেল।

كَرَّةً : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা।

حَسَرٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حَسْرَةً ; অর্থ– আফসোস, দুঃখ, লজ্জা।

لَاتَتَّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুসরণ করো না।

السُّوْٓءِ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اسواء অর্থ– খারাপ কাজ, মন্দ, দোষ, অন্যায়, পাপ।

اَلْفَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْفَاءُ মূলবর্ণ– (ا . ل . ف) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা পেয়েছি।

يَنْعِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ . ضَرَبَ মাসদার اَلنَّعْقُ . اَلنَّعِيْقُ . اَلنُّعَاقُ মূলবর্ণ (ن-ع-ق) অর্থ– সে ডেকেছে, সে চিৎকার করেছে।

অনুবাদ	আয়াত
(অনুবাদ : (১৭৩) আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধু মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত, আর এমন জীব যা গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, ভোগকামী ও সীমা অতিক্রমকারী না হয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না; বাস্তবিকই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়।	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)
(১৭৪) নিঃসন্দেহে, যারা আল্লাহর অবতারিত কিতাব গোপন করে এবং তৎপরিবর্তে নগণ্য সম্পদ আদায় করে, তারা আর কিছুই নয় শুধু নিজেদের পেটে অগ্নি পুরছে, আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে নির্মলও করবেন না, আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤)
(১৭৫) তারা এমন লোক যারা [দুনিয়াতে] হেদায়েত ত্যাগ করে গোমরাহী আর [আখেরাতে] ক্ষমাপ্রাপ্তি ছেড়ে আজাব গ্রহণ করেছে, সুতরাং তারা দোজখের জন্য কত সাহসী।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)
(১৭৬) এই শাস্তি এজন্য যে, আল্লাহ ঠিকভাবেই কিতাব নাজিল করেছেন, আর যারা [এই] কিতাব সম্বন্ধে বিপথ অবলম্বন করে- তা সুবিদিত যে, তারা সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় [লিপ্ত] হবে।	ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৩) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধু الْمَيْتَةَ মৃত জীব وَالدَّمَ রক্ত وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ও শূকরের গোশত وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আর এমন জীব যা গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে فَمَنِ اضْطُرَّ অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ভোগকামী ও সীমা অতিক্রমকারী না হয় فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তবে তার কোনো পাপ হবে না; إِنَّ اللَّهَ বাস্তবিকই আল্লাহ غَفُورٌ বড় ক্ষমাশীল رَحِيمٌ করুণাময়।

(১৭৪) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ নিঃসন্দেহে যারা গোপন করে مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ আল্লাহর অবতারিত কিতাব وَيَشْتَرُونَ بِهِ এবং তৎপরিবর্তে আদায় করে ثَمَنًا قَلِيلًا নগণ্য সম্পদ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ তারা আর কিছুই না পুরছে فِي بُطُونِهِمْ নিজেদের পেটে إِلَّا النَّارَ তবে শুধু অগ্নি وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন وَلَا يُزَكِّيهِمْ এবং তাদেরকে নির্মলও করবেন না وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

(১৭৫) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ তারা এমন লোক اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ [দুনিয়াতে] যারা গ্রহণ করেছে গোমরাহী بِالْهُدَىٰ হেদায়েত ত্যাগ করে وَالْعَذَابَ আর [আখেরাতে] আজাব গ্রহণ করেছে بِالْمَغْفِرَةِ ক্ষমাপ্রাপ্তি ছেড়ে فَمَا أَصْبَرَهُمْ সুতরাং তারা কত সাহসী عَلَى النَّارِ দোজখের জন্য।

(১৭৬) ذَٰلِكَ এই শাস্তি بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ এজন্য যে আল্লাহ নাজিল করেছেন الْكِتَابَ কিতাব بِالْحَقِّ ঠিকভাবেই وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا আর যারা বিপথ অবলম্বন করে فِي الْكِتَابِ কিতাব সম্বন্ধে لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ তা সুবিদিত যে, তারা সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় [লিপ্ত] হবে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ (১৭৭) সকল পুণ্য এতেই নয় যে, তোমরা স্বীয় মুখকে পূর্বদিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে; বরং পুণ্য তো এটা যে কোনো ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতিমদেরকে এবং মিসকিনদেরকে এবং [রিক্তহস্ত] মুসাফিরদেরকে, আর ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাতও আদায় করে, আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে, আর যারা ধীরস্থির থাকে, অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে এবং ধর্ম-যুদ্ধে; তারাই সত্যিকারের মানুষ এবং তারাই [সত্যিকারের] আল্লাহভীরু।	لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (١٧٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৭) لَيْسَ الْبِرَّ সকল পুণ্য এতেই নয় যে اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ তোমরা স্বীয় মুখকে কর قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে وَلٰكِنَّ الْبِرَّ বরং পুণ্য তো এটা যে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ কোন ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ কিয়ামত দিবসের প্রতি وَالْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের প্রতি وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ কিতাব এবং নবীগণের প্রতি وَاٰتَى الْمَالَ আর মাল প্রদান করে عَلٰى حُبِّهٖ আল্লাহর মহব্বতে ذَوِى الْقُرْبٰى আত্মীয়-স্বজনকে وَالْيَتٰمٰى এবং এতিমদেরকে وَالْمَسٰكِيْنَ এবং মিসকিনদেরকে وَابْنَ السَّبِيْلِ এবং [রিক্তহস্ত] মুসাফিরদেরকে وَالسَّآئِلِيْنَ আর ভিক্ষুকদেরকে وَفِى الرِّقَابِ এবং দাসত্ব মোচনে وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَاٰتَى الزَّكٰوةَ এবং জাকাতও আদায় করে وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় اِذَا عٰهَدُوْا যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে وَالصّٰبِرِيْنَ আর যারা ধীরস্থির থাকে فِى الْبَاْسَآءِ অভাব-অভিযোগে وَالضَّرَّآءِ অসুখে-বিসুখে وَحِيْنَ الْبَاْسِ এবং ধর্ম-যুদ্ধে; اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا তারাই সত্যিকারের মানুষ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ এবং তারাই [সত্যিকারের] আল্লাহভীরু ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৩) قوله اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। জাহিলি যুগে আরবের লোকেরা বহু হালাল জিনিসকে হারাম মনে করত এবং বহু হারাম বস্তু ভক্ষণ করত, মৃত প্রাণীর গোশ্ত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশ্ত ইত্যাদি ভক্ষণ করত। ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে মুসলমানরা নবী করীম ﷺ-কে খাদ্যে বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তাদের সে বর্বরোচিত কু-সংস্কারের অপনোদনে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(১৭৪) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদি পুরোহিতগণ সাধারণ লোকজন হতে মনগড়া ফতোয়া প্রদান করে হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করত। তারা তাওরাত গ্রন্থ পাঠান্তে সত্যিকারভাবে জানত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ই সত্য নবী। তারা আশাবাদী ছিল যে, আখেরী নবী তাদের মধ্য হতে আবির্ভূত হবেন, কিন্তু কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করাতে তাদের নেতৃত্ব বিলোপ হওয়া ও হাদিয়া তোহফা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করে। তাই তারা তাওরাতে মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা ও পরিচিতি সম্বলিত বাণীসমূহ সাধারণ লোকদের নিকট হতে গোপন রাখে। তাদের এ ঘৃণিত আচরণের নিন্দা করে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৭৭) قوله لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। খ্রিস্টানরা পূর্বমুখী হয়ে নামাজ আদায় করত এবং ইহুদিরা পশ্চিমমুখী অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসের

দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করত। প্রত্যেক দলেই নিজ নিজ কেবলা নিয়ে গর্ব করত এবং কেবলার মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে মনে করত। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দেশের লক্ষ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু সামগ্রীকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরিউক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কুরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্রিত করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত : এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরিয়ত বিধান অনুযায়ী জবাই করা জরুরি, সেসব প্রাণী যদি জবাই ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে যেমন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে, কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কুরআন শরীফের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।' এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় জবাই করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এ গুলো জবাই ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল মাছ এবং টিড্ডি। সুতরাং বুঝা গেল, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি জবাই না করেও খাওয়া যাবে। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপর ভেসে উঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না –[জাসসাস] অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে জবাই করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ বলে তীর কিংবা অন্য কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত, যাতে রক্ত বের হয়।

মাসআলা : ইদানিং এক রকম চোখা গুলি ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের গুলি সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলির আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলি চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলি চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও জবাই করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সে একই বিধান প্রযোজ্য।

অর্থাৎ, এগুলোর ব্যাবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনোভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্‌ত নিজ হাতে কোনো গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েজ নয়; বরং সেগুলো এমন কোনো স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়াল খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েজ হবে না। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী]

মাসআলা : 'মৃত' শব্দটির অন্য কোনো বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েজ। কেননা কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে– وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ
এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে জবাই করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। –[জাস্‌সাস]

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাক না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাক করে নেওয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েজ। সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। –[জাস্‌সাস]

মাসআলা : মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তা দ্বারা তৈরি যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

রক্ত : আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا অর্থাৎ 'প্রবহমান রক্ত' উল্লিখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা জবাই করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-জকৃত প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলা : যেহেতু শুধুমাত্র প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই জবাই করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফিকহবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা-মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশি হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত। –[জাস্সাস]

মাসআলা : রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য-কোনো উপয়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা অর্জিত লাভালাভও হারাম। কেননা কুরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোনো বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বুঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাসআলা : এই মাসআলার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ : রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত। প্রথমতঃ মানুষের যেকোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থি। **দ্বিতীয়ত :** এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী। আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েজ নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোনো প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না, কোনো অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুঁই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিগণিত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামি শরিয়ত মানুষের দুধকে শিশু খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে।

"ঔষধ হিসেবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই।" –[আলমগীরী]

ইবনে কুদামা রচিত 'মুগনী' গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। –[মুগনী, কিতাবুস সায়ীদ, ৮ম খ. ২০৬ পৃ.]

রক্তকে যদি দুধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানব-দেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ, মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফিকহবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরিয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায় ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। 'নিরুপায় অবস্থায়' অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোনো ঔষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কুরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েজ হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ফিকহবিদ একে জায়েজ বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েজ বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে 'হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ : আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের গোশ্ত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহম' বা গোশ্ত শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশত হারাম একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, গোশত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহম' তথা গোশত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায়, তাই এটি জবাই করলেও পাক হয় না। কেননা গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের জবাই করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু জবাই করার পরেও শূকরের গোশত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরি সূতা ব্যবহার করা জায়েজ বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। –[জাস্সাস, কুরতুবী]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে যা জবাই করা হয় : আয়াতে উল্লিখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা হয় অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে : প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং জবাই করার সময়ও সে নাম নিয়েই জবাই করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এমতাবস্থায় জবাইকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফিকহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোনো অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতে যে অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা জবাই করা হয়, তবে জবাই করার সময় তা আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুজুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি মান্নত করে তা জবাই করে থাকে। কিন্তু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই তা জবাই করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং জবাইকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসির এবং ফিকহবিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে জবাইকৃত জীবের" বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তাফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে–

'সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। জবাই করার সময় তা আল্লাহর নামেই জবাই করা হোক না কেন। কেননা আলেম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোনো জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নেকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানও জবাই করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার জবাইকৃত পশুটি মুরতাদের জবাইকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।'

দুররে মুখতার -এর কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

"যদি কোনো আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থে কোনো পশু জবাই করা হয়, তবে জবাই কৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা এটাও তেমনি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে যা জবাই করা হয়।" এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই তা জবাই করা হয়। আল্লামা শামী (র.) ও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। –[দুররে মুখতার, ৫ খণ্ড, ২১৪ পৃ.]

কেউ কেউ অবশ্য উপরিউক্ত সুরতটিকে وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বুঝায় না। তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়,' সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতা প্রসূত।

উপরিউক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কুরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলিল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ বাতেলপন্থিরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে نُصُبٌ বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় সে সমস্ত পশু, যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়েছে।

'আরবদের স্বভাব ছিল, যার উদ্দেশ্যে জবাই করা হতো, জবাই করার সময় তার স্বরে সেই নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে 'এহলাল' অর্থাৎ 'তার স্বরে নামোচ্চারণ' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় কোনো না কোনো উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন–

'সে উৎসব দিবসের জন্যেই যেসব পশু জবাই করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।' –[তাফসীরে কুরতুবী, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃ.]

মোটকথা দ্বিতীয় সুরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু জবাই করা হয় আল্লাহর নামেই, সেটি হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আয়াতের হুকুম দ্বিতীয় আয়াত وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ-এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণির পশুর গোশ্‌তও হারাম।

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোনো চিহ্ন অঙ্কিত করে কোনো দেব-দেবী বা পীর-ফকিরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোনো কাজ নেওয়া হয়না, জবাই করাও উদ্দেশ্য থাকে না; বরং জবাই করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণির পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনোটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণির পশুকে কুরআনের ভাষায় 'বাহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ, কারো নামে কোনো পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন– বলা হয়েছে–

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ

"আল্লাহ তা'আলা বাহীরা বা 'সায়েবা' -এর প্রচলন করেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না; বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতোই হালাল।"

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরিয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সে মতে উৎসর্গকারী যদি সে পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা ও দানগ্রীহতার জন্য হালাল। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখি উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতেরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণির কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুজুর্গের মাজারে ছাগল-মুরগি ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাজারের খাদেমরাই সাধারণতঃ উৎসর্গীকৃত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণির জীব-জন্তু ক্রয় করা, জবাই করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; বলেছে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ "তাতে তার কোনো পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে। কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরিয়তের হুকুম-আহকাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ এ কাজের পরিণতি তাই। কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোজখের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সে কথা-পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার এসব কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহর দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে দোষ ত্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকত, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের প্রতি অবিরাম নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ বিতর্কের ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে, নামাজের পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে।

মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরিয়তের অন্য কোনো হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদি, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে, এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুন্য বা নেকী আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ভিতরেই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি নামাজে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথা দিক হিসেবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোনো পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য-একান্তভাবেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা যতদিন বায়তুল মাকদিসের প্রতি মুখ করে নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য ১৭৭তম আয়াত থেকে সূরা বাকারার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে এ'তেকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদত, মো'আমালাত বা লেনদেন এবং নৈতিকতা ও আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয়– ই'তেকাদ বা মৌলবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইবাদত এবং মো'আমালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনা وَاٰتَى الزَّكٰوةَ পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর মো'আমালাতের আলোচনা وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা وَالصّٰبِرِيْنَ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লোকই সত্যিকার মুমিন, যারা এসব নির্দেশাবলির পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এসব লোককেই প্রকৃত মুত্তাকী বলা যেতে পারে।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথমে ধন-সম্পদ ব্যয় করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে জাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এ দু'টি খাত জাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে জাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণতঃ মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়।

মাসআলা : এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরজ শুধুমাত্র জাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, জাকাত ছাড়া আরো বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরজ ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। –[জাসসাস, কুরতুবী] যেমন, রুজি-রোজগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে জাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরজ হয়ে পড়ে। অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং দীনি শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরজের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, জাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোনো অবস্থায় জাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেওয়া শর্ত।

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ বাক্যটিতে কারক পদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গুনাহগাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

তেমনিভাবে মো'আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

এরপরই আখলাক বা মন মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র, 'সবর' এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সবর এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ অভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

بَاغٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্যায়কারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী।

وَيَشْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) অর্থ– তারা বিনিময় গ্রহণ করে।

اشْتَرَوُا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) অর্থ– তারা ক্রয় করেছে।

مَا اَصْبَرَهُمْ : এটি صَبْرٌ মাসদার থেকে مَا اَفْعَلَ-এর ওজনে فعل تعجب অর্থ– তারা কতইনা ধৈর্যশীল।

الْمَلٰٓئِكَةِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَلَكٌ অর্থ– ফেরেশতাগণ।

الْمُوْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পূর্ণকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এখানে و টি হরফে আতফ ل টি حرف جار هم টি مجرور ও জার ও মাজরূর মিলে হলো متعلق শবে ফে'ল موجود উহ্য-এর সাথে, এবার شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে হয়ে شبه جملة মুকাদ্দাম خبر মুকাদ্দাম আর عَذَابٌ শব্দটি موصوف এবং اَلِيْمٌ শব্দটি صفت এবার موصوف ও صفت মিলে مبتدأ مؤخر তারপর মুবতাদা ও খবার মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبهة بالفعل আর الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اخْتَلَفُوْا ফে'ল এতে هم উহ্য সর্বনামটি তার ফা'য়েল, فِى الْكِتٰبِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; এখন فعل ও فاعل আর متعلق মিলে جملة হয়ে صلة এবার موصول তার صلة মিলে اِن-এর اسم; অতঃপর ل টি تاكيد এর জন্য فى হলো حرف جار আর شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে হলো متعلق উহ্য مشغول شبه فعل-এর সাথে, شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে اِن-এর خبر হলো اِن তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : لَيْسَ টি فعل ناقص আর الْبِرَّ হলো ليس-এর খবর এবং اَن টি ناصبة, অতঃপর تُوَلُّوْا হলো فعل এতে انتم হলো فاعل , আর وجوهكم টি مضاف ও مضاف اليه মিলে হয়েছে, مفعول به হলো قِبَلَ মিলে مضاف আর الْمَشْرِقِ হলো معطوف عليه ও و টি حرف عطف আর الْمَغْرِبِ হলো معطوف ;এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে مضاف اليه ; এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه এখন فعل ـ فاعل ও উভয় مفعول মিলে ليس এর اسم হয়েছে, ليس তার اسم ও خبر মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ : এখানে اولـئك শব্দটি مبتدأ এবং هم টি পুনঃ مبتدأ আর الْمُتَّقُوْنَ হলো خبر; এখন مبتدا ও خبر মিলে বাক্য হয়ে পুনঃ اُولٰٓئِكَ মুবতাদার এর, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٨)

অনুবাদ (১৭৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর কেসাস ফরজ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে, আজাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আজাদ ব্যক্তি, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী, পরন্তু যাকে স্বীয় প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে কিছু মাফ করা হয়, তবে [বাকিটুকু] যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করে এবং [হত্যাকারী যেন] সদ্ভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সহজ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ, অতঃপর যে ব্যক্তি তার পর সীমালঙ্ঘন করে, তবে তার জন্য কঠিন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧٩)

(১৭৯) আর হে জ্ঞানীগণ! এই কেসাসে [-র আইনে] তোমাদের জন্য প্রাণ রক্ষার [মহা ব্যবস্থা] রয়েছে, আশা করি, তোমরা [এরূপ শান্তিপূর্ণ আইনের বিরোধিতা হতে] বিরত থাকবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ؕ (١٨٠)

(১৮০) তোমাদের উপর ফরজ করা হচ্ছে যে, যখন কারো মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হয়– যদি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু অসিয়ত করবে, মুত্তাকীদের জন্য তা অবশ্য কর্তব্য।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে الْقِصَاصُ কেসাস فِي الْقَتْلٰى নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ আজাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আজাদ ব্যক্তি وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ গোলামের পরিবর্তে গোলাম وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى এবং নারীর পরিবর্তে নারী فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ পরন্তু যাকে কিছু মাফ করা হয় مِنْ اَخِيْهِ স্বীয় প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ তবে [বাকিটুকু] যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করে وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ এবং [হত্যাকারী যেন] সদ্ভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। ذٰلِكَ এটা تَخْفِيْفٌ সহজ ব্যবস্থা مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَرَحْمَةٌ ও অনুগ্রহ فَمَنِ اعْتَدٰى অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে بَعْدَ ذٰلِكَ তার পর فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তবে তার জন্য কঠিন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

(১৭৯) وَلَكُمْ আর তোমাদের জন্য রয়েছে فِي الْقِصَاصِ এই কেসাসে [-র আইনে] حَيٰوةٌ প্রাণ রক্ষার [মহা ব্যবস্থা] يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানীগণ! لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশা করি, তোমরা [এরূপ শান্তিপূর্ণ আইনের বিরোধিতা হতে] বিরত থাকবে।

(১৮০) كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ফরজ করা হচ্ছে যে اِذَا حَضَرَ যখন নিকটবর্তী মনে হয়– اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ কারো মৃত্যু اِنْ تَرَكَ خَيْرَا যদি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে الْوَصِيَّةُ তবে কিছু অসিয়ত করবে لِلْوَالِدَيْنِ পিতা-মাতা وَالْاَقْرَبِيْنَ ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য بِالْمَعْرُوْفِ ন্যায়সঙ্গতভাবে حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীদের জন্য তা অবশ্য কর্তব্য।

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ؕ (١٨١)

অনুবাদ (১৮১) অতঃপর যে ব্যক্তি শুনার পর এটা পরিবর্তন করবে, তবে এর পাপ তাদেরই হবে যারা এটাকে পরিবর্তন করে। আল্লাহ তো নিশ্চয় শুনেন জানেন।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٨٢)

(১৮২) হাঁ, তবে যার নিকট সাব্যস্ত হয় অসিয়তকারীর পক্ষ হতে কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা কোনো অন্যায় আচরণ, অনন্তর সে ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না; বাস্তবিকই আল্লাহ তো ক্ষমাকারী, অনুগ্রহশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٨٣)

(১৮৩) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর, আশা যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٤)

(১৮৪) অল্প কয়েক দিন মাত্র [রোজা রেখ], পরন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি [এরূপ] অসুস্থ [রোজা রাখতে অক্ষম] হয়, কিংবা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম তাদের জিম্মা ফিদিয়া একজন দরিদ্রের খোরাক [দেওয়া], আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খায়ের করে [ফিদিয়া বেশি দেয়], তবে তার জন্য আরো উত্তম, আর তোমাদের জন্য রোজা রাখা খুবই উত্তম, যদি তোমরা [রোজার ফজিলতের] খবর রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮১) فَمَنْ بَدَّلَهٗ অতঃপর যে ব্যক্তি পরিবর্তন করবে بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ এটা শুনার পর فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ তবে এটার পাপ হবে عَلَى الَّذِيْنَ তাদেরই যারা يُبَدِّلُوْنَهٗ এটাকে পরিবর্তন করে। اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ سَمِيْعٌ শুনেন عَلِيْمٌ জানেন।

(১৮২) فَمَنْ خَافَ হাঁ, তবে যার নিকট সাব্যস্ত হয় مِنْ مُّوْصٍ অসিয়তকারীর পক্ষ হতে جَنَفًا কোনো প্রকার ত্রুটি اَوْ اِثْمًا কিংবা কোনো অন্যায় আচরণ فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ অনন্তর সে ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেয় فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ তবে তার কোনো পাপ হবে না اِنَّ اللّٰهَ বাস্তবিকই আল্লাহ غَفُوْرٌ ক্ষমাকারী رَّحِيْمٌ অনুগ্রহশীল।

(১৮৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُتِبَ عَلَيْكُمُ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে الصِّيَامُ রোজা كَمَا كُتِبَ যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তীগনের উপর لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশা যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

(১৮৪) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ অল্প কয়েক দিন মাত্র [রোজা রেখ] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ পরন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি مَّرِيْضًا অসুস্থ [রোজা রাখতে অক্ষম] হয় اَوْ عَلٰى سَفَرٍ কিংবা সফরে থাকে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম فِدْيَةٌ তাদের জিম্মা ফিদিয়া طَعَامُ مِسْكِيْنٍ একজন দরিদ্রের খোরাক [দেওয়া] فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খায়ের করে [ফিদিয়া বেশি দেয়] فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ তবে তার জন্য আরো উত্তম وَاَنْ تَصُوْمُوْا আর তোমাদের জন্য রোজা রাখা خَيْرٌ لَّكُمْ খুবই উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা [রোজার ফজিলতের] খবর রাখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى الخ (১৭৮) আয়াতের শানে নুযূল : ইসলাম ধর্ম প্রচলিত হওয়ার পূর্বে আরবের মধ্যে দু'টি গোত্র ছিল। একটি আউস ও দ্বিতীয়টি খাযরাজ। উভয়ের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়েছিল। তাতে বিজয়ী গোত্র পরাজিত গোত্রের বহু দাস ও মহিলাকে হত্যা করেছিল। মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পর তারা উভয় গোত্রই মুসলমান হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী আক্রোশ পূর্ণ মনোভাব থেকে যায়। কেননা পরাজিত গোত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশীয় হিসেবে গণ্য ছিল। তাই তারা বিজয়ী গোত্রের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমাদের মধ্য হতে একজন দাসের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং একজন মহিলার পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করব। তাদের এ অতিরঞ্জিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিসাস-এর বিধানের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قوله كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الخ (১৮০) আয়াতের শানে নুযূল : তদানীন্তন জাহেলিয়াতের যুগে নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর সময় অন্যের জন্য নিজের সকল ধন-সম্পদের অসিয়ত করে যাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ফলে মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি সবাই তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ত। ইসলামের আগমনের পর এ বঞ্চনামূলক ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে এ ধরনের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قوله الْقِصَاصُ : কিসাস এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– সমপরিমাণ বা অনুরূপ করা, অর্থাৎ অন্যায় পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শরিয়তের পরিভাষায় কিসাসের অর্থ হলো হত্যা বা আঘাতের সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা। হত্যার পরিবর্তে হত্যা করতে হবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে হত্যা করতে হবে তা নয়।

কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কীয় বিধান : স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার পরিবর্তে বিপক্ষের এক জনকে সর্বসম্মতিক্রমে হত্যা করাকে শরিয়তে কিসাস রূপে নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ক্রীতদাসের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং একজন মহিলার পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে না বলে প্রমাণ পেশ করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রয়োজনে পুরুষকে হত্যা করা যাবে বলে প্রমাণ পেশ করেন। তিনি দলিল পেশ করেন যে, "প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ" ও "মুসলমানের রক্ত পরস্পরের সমান।" তিনি উপরিউক্ত ইমামদ্বয়ের যুক্তির উত্তরে বলেন– "আজাদ লোককে ক্রীতদাসের পরিবর্তে ও পুরুষকে স্ত্রীলোকের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।" এ দলিল দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দু'ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হতে বিরত রাখা এবং উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। তাঁর (আবূ হানীফার) মাযহাব মোতাবেক হত্যাকারী যে-ই হোকনা কেন; হত্যার দায়ে তাকে প্রাণদণ্ড ভোগ করতেই হবে।

قوله فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ الخ -এর বিশ্লেষণ : কিসাসের বিধানের মধ্যে বিরাট জীবন রক্ষার উপায় নিহিত রয়েছে। কারণ হত্যাকারী যখন জানতে পারবে যে, সে হত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে, তখন সে হত্যা হতে বিরত থাকবে। ফলে সে নিজেও বাঁচল এবং যাকে হত্যা করবে সেও বাঁচল। কিসাস গ্রহণের আদেশের ফলে এভাবে বহু লোকের জীবন রক্ষা পেল।

قَتْل -এর প্রকারভেদ : قَتْل পাঁচ প্রকার : (১) قَتْل عَمْد বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা (২) قَتْل شِبْه عَمْد বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা (৩) قَتْل خَطَأً বা ভুলক্রমে হত্যা (৪) قَتْل جَارِىْ مَجْرٰى خَطَأً বা ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা (৫) قَتْل سَبَبْ বা কারণিক হত্যা।

(১) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা : কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে কাউকে অস্ত্র অথবা অস্ত্রের সমতুল্য অন্য কিছু দ্বারা হত্যা করলে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা বলে।

বিধান : এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের দরুন হত্যাকারী গুনাহগার হবে এবং কিসাস ওয়াজিব হবে। তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তার কোনো কাফফারা নেই।

(২) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা : এমন কোনো জিনিস দ্বারা আঘাত করা, যার আঘাতে সাধারণত নিহত হয় না। এ ধরনের হত্যাকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ হত্যা বলে।

বিধান : সাহেবাইন -এর মতানুযায়ী এতে গুনাহ ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। এতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে এতে عَاقِلَه قَاتِلْ -এর উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে।

(৩) ভুলক্রমে হত্যা : ইচ্ছায় ভুল অথবা কাজের ভুলবশত হত্যা করা।

ইচ্ছায় ভুল : যেমন– শিকার মনে করে কোনো মানুষের প্রতি তীর অথবা গুলি ছুঁড়া।

কাজের ভুল : যেমন– কোনো লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তীর ছুঁড়লে ভুলে তা কোনো মানুষের উপর পড়ে মৃত্যুবরণ করা।

বিধান ঃ এতে রক্তপণ ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। গুনাহ হবে না।

(৪) ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা : যেমন– ঘুমের ঘোরে পড়ে অন্য কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তিকে মেরে ফেলল।

বিধান ঃ এর বিধান ভুলের বিধানের মতোই বর্তাবে।

(৫) কারণিক হত্যা : যেমন– কোনো ব্যক্তি খেতে পানি দেওয়ার জন্য ক্ষেতের কোণায় কূপ খনন করল, তার মধ্যে কেউ পড়ে মারা গেল।

বিধান ঃ হত্যাকারীর উপর রক্তপণ বর্তাবে। কাফ্ফারা ও কিসাস ওয়াজিব হবে না।

دِيَتٌ বা অর্থদণ্ডের বিধান : অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে সে জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয় নয়। সে জন্য দিয়ত বা হত্যার বিনিময় প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকারীগণ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা সম্পন্ন করা। আর দিয়তের পরিমাণ হচ্ছে– মধ্যম আকৃতির একশতটি উট অথবা এক হাজার দীনার অথবা দশ হাজার দিরহাম। বর্তমান কালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দিরহাম সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সে মতে পূর্ণ দিয়ত-এর পরিমাণ হচ্ছে দু'হাজার নয় শত তোলা আট মাসা রৌপ্য।

حُرٌّ কে عَبْد -এর বিনিময়ে এবং মুসলিমকে ذِمِّى -এর বিনিময়ে হত্যার হুকুম : সকল কূফাবাসী, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবী লায়লাসহ সকল আহনাফের মতে আজাদ ব্যক্তিকে দাসের বিনিময়ে এবং মুসলিমকে জিম্মির বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। কেননা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى আয়াতে عَامّ ভাবে বলা হয়েছে। এ ছাড়া জিম্মি, মুসলিমদের সাথে রক্তের দিক থেকে সমান। অধিকাংশের মতে حُرٌّ কে عَبْد -এর বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। কেননা উভয়ের মাঝে সমতা নেই। দু'জন দু'প্রকারের। এছাড়া দাস বিক্রি করা যায় حُرٌّ -কে বিক্রি করা যায় না। স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রি করে আর দাস-বিক্রি হয়।

পিতা পুত্রকে হত্যার বিধান : অধিকাংশ আলিমের মতে পুত্র হত্যার কারণে পিতা হতে কিসাস নেওয়া যাবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি ইচ্ছা করে হত্যা করে, তবে বিনিময়ে পিতাকে হত্যা করা হবে। আর যদি ছেলে পিতাকে হত্যা করে তবে ছেলেকে হত্যা করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

একজনের কারণে একদলকে হত্যার হুকুম : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, একজনের বিনিময়ে একদলকে হত্যা করা যাবে না। কেননা একজন আর একদল সমান হয় না। অন্যান্যদের মতে হত্যা করা যাবে।

قوله فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ -এর মর্মার্থ : প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। এখানে মারূফ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এ শব্দটি কুরআনের বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ সাধারণত ও স্বভাবত যেসব সঠিক কাজ ও কর্মনীতির সাথে পরিচিত হয়ে থাকে, যাকে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তিই সত্য ও ইনসাফ এবং সঠিক কর্মনীতি বলে অভিহিত করে, এ শব্দ দ্বারা তাই বুঝানো হয়। সাধারণতঃ প্রচলিত আইনকেও ইসলামি পরিভাষায় উরফ কিংবা মারূফ বলা হয়। আর শরিয়ত যেসব বিষয় ও ব্যাপারে কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করেনি, সে সব ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয়।

قوله فَمَنِ اعْتَدٰى -এর মধ্যকার সীমালঙ্ঘন : নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তের বিনিময় গ্রহণ করার পরও যদি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে কিংবা হত্যাকারী রক্তের বিনিময় প্রত্যার্পণ করতে টালবাহানা করে এবং হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে নম্র ব্যবহার করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে, তবে এটাকে বাড়াবাড়ি বলা হবে।

মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ : মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ হলো মৃত্যুর নিদর্শন হিসেবে উপসর্গাদি দেখা দেওয়া। যেমন– বার্ধক্য, মারাত্মক ব্যাধি, বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইত্যাদি।

আয়াতে خَيْر -এর অর্থ : خَيْر শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো– ধন-সম্পদ। সকল মুফাসসিরের ঐকমত্যে আয়াতে خَيْر দ্বারা ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। তবে এ ধন-সম্পদের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ আছে যেমন– (ক) সাতশত দিনারের বেশি, (খ) এক হাজার দিনার, (গ) পাঁচশত দিনারের বেশি।

وَصِيَّة -এর অর্থ ও তার حُكْم : শাব্দিক অর্থে যে কোনো কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে অসিয়ত বলা হয়। পরিভাষায় ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে কোনো হুকুম সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দেওয়া হয়; তাকেই অসিয়ত বলে।

হুকুম : ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো– যার উপর ঋণ, গচ্ছিত সম্পদ বা অন্য কোনো পাওনা রয়েছে সে যেন এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যায়। এটা তার উপর ফরজ। অসিয়ত সম্পর্কে তিনটি মূলনীতি রয়েছে। যেমন– (১) মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোনো অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃতব্যক্তির অসিয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।– (২) এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা মৃতের উপর ফরজ।–(৩) এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি অসিয়ত করা জায়েজ নয়।

উপরিউক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মিরাশের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মানসূখ হয়ে গেছে। ইবনে কাছীর ও হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে অসিয়ত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মিরাশের আয়াত দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় নির্দেশটিও একাধারে কুরআনের মিরাশ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। তেমনিভাবে বিদায় হজের সময় রাসূল ﷺ কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশ إِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰى لِكُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ -এর মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অসিয়ত সম্পর্কে আলিমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ আদায় করা জায়েজ। এমনকি উত্তরাধিকারীগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও অসিয়ত করা জায়েজ এবং গ্রহণযোগ্য।

অসিয়তের পরিমাণ : কতটুকু অসিয়ত করতে হবে এ ব্যাপারে আয়াতে কোনো ইঙ্গিত নেই। তবে হাদীস দ্বারা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অসিয়তের কথা পাওয়া যায়। যেমন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার যত সম্পদ রয়েছে তার উত্তরাধিকার রয়েছে একমাত্র মেয়ে, আমি আমার সম্পদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ কি অসিয়ত করব? নবী করীম ﷺ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে অর্ধেক? নবী কারীম ﷺ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? মহানবী ﷺ বললেন– এক তৃতীয়াংশ, তাহলেও অনেক বেশি হয়ে যায়। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে মানুষের দ্বারে ধর্ণা দেওয়ার অবস্থায় রাখার চেয়ে ধনী অবস্থায় রাখা অনেক উত্তম। কারো মতে এক-চতুর্থাংশ, কারো মতে এক-পঞ্চমাংশ।

মাতাপিতার জন্য অসিয়ত সম্পর্কে মতভেদ : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা পিতামাতার জন্য অসিয়তের প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন– لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ ওয়ারিশদের জন্য কোনো অসিয়ত নেই। একদল ওলামার মতে আয়াতের হুকুম এখনো বাকি আছে। তারা বলেছেন ঐ পিতামাতার জন্য অসিয়ত করতে হবে যারা وَارِثٌ নয়। যেমন– কাফের পিতামাতা।

قَوْلُهٗ اَلصِّيَامُ : صَوْم -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা, আর শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে صَوْم বা রোজা বলে। দ্বিতীয় হিজরি সনের রমজান মাসে রোজা ফরজ হয়।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর রোজার হুকুম : মুসলমানদের প্রতি রোজা ফরজ হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নবীর উল্লেখসহ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোজা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরজ করা হয়নি; বরং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরজ করা হয়েছে। তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, রোজা একটা কষ্টকর ইবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরজ করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরজ করা হয়েছিল। مِنْ قَبْلِكُمْ বলতে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত

মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরিয়তকেই বুঝায়। এতে বুঝা যায় যে, নামাজের ইবাদত থেকে যেমন কোনো উম্মত বা শরিয়তই বাদ ছিল না, তেমনই রোজাও সবার জন্য ফরজ ছিল।

রুগ্ণ ব্যক্তির রোজা : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا বাক্যে উল্লিখিত রুগ্ণ বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায়, রোজা রাখতে যার কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন রোগীর জন্য রোজা ভঙ্গ করার নির্দেশ রয়েছে।

মুসাফিরের রোজা : আয়াতাংশে أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন– বাড়িঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোজার ব্যাপারে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না, সেখানে মুসাফিরের শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং অন্যান্য ফিকহবিদগণের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মনযিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে ততটুকু দুরত্বের সফরকারীকে মুসাফির বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলিমগণ "মাইল" এর হিসেব অনুযায়ী ৪৮ (আটচল্লিশ) মাইল এবং বর্তমানে কিলোমিটার হিসেবে ৭৭ (সাতাত্তর) কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলে এবং ১৫ দিন অথবা তার চেয়ে কম সময় অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে মুসাফির বলে।

আর মুসাফিরের প্রতি রোজার ব্যাপারে সফর জনিত অব্যাহতি ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফরের মধ্যে থাকে। সফরের মুদ্দত অতিবাহিত হলে সে ব্যক্তি আর "মুসাফির" এর গণ্ডির মধ্যে থাকে না, ফলে সে রোজার অব্যাহতি পাবে না।

রোজার কাজা : রুগ্ণ ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় আর মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় যে কয়টি রোজা রাখতে পারেনি সে কয়টি রোজা রমজান ব্যতীত অন্য সময়ে পূরণ করে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব। রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ি ফেরার পর রমজান মাস বহাল থাক্লে তা যথাযথ পালন করবে। আর যদি সে সুস্থ হওয়ার বা বাড়ি ফেরার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার কাজা কিংবা ফিদিয়ার জন্য অসিয়ত করা জরুরি নয়। ভাংতি রোজা এক সাথে ধারাবাহিকভাবে রাখা জরুরি নয়; বরং মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে। শুধু সংখ্যাগুলো পূরণ করলেই চলবে।

রোজার ফিদিয়া ও তার পরিমাণ : যারা অতিরিক্ত বার্ধক্য জনিত কারণে রোজা রাখতে অক্ষম অথবা দীর্ঘ কাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে। সেসব লোকের বেলায় রোজা না রেখে রোজার বদলায় "ফিদিয়া" দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে রোজা রাখতে পারলে তা হবে সব চেয়ে কল্যাণকর। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলায় সের হিসেবে অর্ধ "সা" পৌনে দু'সের পরিমাণ গম অথবা প্রচলিত বাজার মূল্য কোনো মিসকিনকে দান করে দিলে একটি রোজার ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। তবে এক রোজার "ফিদিয়া" একাধিক মিসকিনকে দেওয়া অথবা একাধিক রোজার ফিদিয়া একই সাথে এক ব্যক্তিকে দেওয়া জায়েজ।

রোজা ফরজ হওয়ার সময়কাল ও হুকুম : ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকামের ন্যায় রোজাও ক্রমান্বয়ে ফরজ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ ইসলামের শুরুতে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক মাসে শুধু তিন দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রোজা ফরজ ছিল না। দ্বিতীয় হিজরি সালের রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ জারি হয়, কিন্তু তাতেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাখতে ইচ্ছা করতো না, তারা প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করলেই রোজার দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে। পরবর্তী বছর দ্বিতীয় হুকুম নাজিল হয়। তাতে এ সাধারণ সুবিধাটি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু রুগ্ণ, যে রোজা রাখলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয় অথবা শরয়ী মুসাফির ও গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু ধাত্রী মহিলা এবং রোজা রাখার সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এ সুযোগ যথারীতি বহাল রাখা হয়।

রমজানের পূর্বে মুসলমানদের রোজা : أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উপর যে রোজা ফরজ হয়েছিল তা ছিল রমজানের দিনগুলোর রোজা। এটা অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

হযরত কাতাদা এবং আতা (রা.) বলেন, প্রত্যেক মাসে মুসলমানদের উপর তিনটি করে রোজা ফরজ ছিল। তারপর তাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল। তাদের দলিল হলো– وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ কেননা এ আয়াতটি

রোজাকে এমনভাবে وَاجِبٌ করে যা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। রোজা রাখতে পারে অথবা ফিদ্ইয়া দিতে পারে। কিন্তু রমজানের রোজা এমনভাবে ওয়াজিব, যা রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুতরাং ঐ রোজাগুলো রমজানের রোজা নয়।

অধিকাংশ আলেমের মতে, দলিল হলো– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াতটি মুজমাল, তাতে এক, দুই বা অনেক দিনের রোজা হতে পারে। তাই اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ দ্বারা এই মুজমালের তাফসীর করা হয়েছে। এটা দ্বারাও সপ্তাহ বা মাসের রোজার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর شَهْرُ رَمَضَانَ-এর বর্ণনা এসেছে। অতএব বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উপর প্রথম থেকেই রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। –[আয়াতুল আহকাম, ছাবূনী]

রোজা ভঙ্গের অনুমোদিত রোগের পরিমাণ : আল্লাহ তা'আলা রোগীর জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট করুণা; কিন্তু কতটুকু রোগ হলে রোজা ভঙ্গ করা যাবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আহলে জাওয়াহেরের মতে সাধারণত রোগ হলেই রোজা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে। যেমন– আঙ্গুলের ব্যথা।

কারো নিকট এমন রোগ গ্রহণযোগ্য যাতে রোজা রাখলে কষ্ট বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

চার ইমামের মতে মারাত্মক রোগ যা রোজার কারণে বৃদ্ধি হতে পারে, অথবা মৃত্যুর ভয় আছে, অথবা সুস্থতা আসতে বিলম্ব ঘটতে পারে, তখন রোজা ভঙ্গ করা যাবে।

দলিল : আহলে জাওয়াহের দলিল হিসেবে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا আয়াতকে পেশ করেন। এখানে مَرَضٌ-কে সাধারণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, বেশি-কমের কথা বলা হয়নি।

জমহুর ওলামা يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-আয়াতকে পেশ করেন। কেননা এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অনুমতি কষ্ট এড়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। অতএব, রোগ কম হলে কষ্ট অনুপস্থিত থাকে।

রোজা না রাখার অনুমোদিত সফরের পরিমাণ : সকল ফকীহ এ কথায় একমত যে, সফর দূরে হতে হবে। কিন্তু ঐ দূরত্ব কতটুকু তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

- ➢ আওযায়ীর মতে একদিনের পথ হতে হবে।
- ➢ ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে দু'দিন ও দু'রাতের পথ হতে হবে। এ হিসেবে ষোল ফরসখ বা ৪৮ মাইল হয়।
- ➢ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সুফিয়ান সাওরীর মতে তিন দিন ও তিন রাত্রির পথ হতে হবে। এ হিসেবে ২৪ ফরসখ অর্থাৎ ৭২ মাইল হয়। –[আয়াতুল আহকাম]

রোজা রাখা বা ভাঙ্গার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে শক্তি থাকলে রোজা রাখাই উত্তম। আর শক্তিহীন দুর্বল ব্যক্তির জন্য রোজা না রাখাই উত্তম। কেননা শক্তিমানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ আর শক্তিহীন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ বলেন– يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

ইমাম আহমদের মতে রোজা না রাখা উত্তম। কেননা আল্লাহ এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করাই উত্তম। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) -এর মতে যা সহজ তা গ্রহণ করাই উত্তম। রোজা রাখতে সক্ষম হলে রোজা রাখাই উত্তম, আর না রাখা সহজ হলে না রাখাই উত্তম।

গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনীর হুকুম : গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়িনী মহিলা যদি নিজের জীবনের ভয় করে, অথবা সন্তানের ব্যাপারে ভয় করে, তবে রোজা ভাঙ্গতে পারবে, এমতাবস্থায় তারা রোগীর ন্যায়। তবে কাজার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার মতে শুধু কাজা করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে ফিদইয়াসহ কাজা করতে হবে।

রোজার ফিদিয়া : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আয়তের স্বাভাবিক অর্থ– দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোজা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোজা না রেখে রোজার বদলায় 'ফিদিয়া' দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, রোজা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরিউক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোজায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-এর দ্বারা প্রাথিমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন

দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরিউক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই। –[জাস্‌সাস, মাযহারী]

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.)-এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে, যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ শীর্ষক আয়াতটি নাজিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোজা রাখতে পারে এবং যে রোজা রাখতে না চায়, সে ফিদিয়া দিয়ে দিবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ নাজিল হলো, তখন ফিদিয়া দেওয়ার এখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোজা রাখাই জরুরি সাব্যস্ত হয়ে গেল।

ফিদিয়ার পরিমাণ এবং আনুষাঙ্গিক মাসআলা : একটি রোজার ফিদিয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলা সের হিসেবে অর্ধ সা' একসের সাড়ে বার ছটাক হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোনো মিসকিনকে দান করে দিলেই একটি রোজার ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। ফিদিয়া কোনো মসজিদ বা মাদরাসায় কার্যরত কোনো লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েজ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحُرُّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَحْرَارٌ অর্থ– আজাদ, মুক্ত।

اعْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে সীমালঙ্ঘন করে।

مُوْصٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْصَاءُ মূলবর্ণ (و . ص . ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– অসিয়তকারী।

مَعْدُوْدَاتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَعْدُوْدَةٌ অর্থ– গণিত, যা গণনা করা হয়। গণনা করা কয়েকটি দিন।

مَرِيْضًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَمْرَاضٌ ; অর্থ– রোগী, অসুস্থ।

تَطَوَّعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনসে اجوف واوى অর্থ– স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ : এখানে واو টি হরফে আতফ। আর لَ টি হরফে জার كُمْ টি মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো موجود উহ্য شبه فعل এর সাথে। شبه فعل তার متعلق মিলে خبر مقدم হলো فِى الْقِصَاصِ জার ও مجرور মিলে متعلق হলো শিবহে ফে'ল এর সাথে حَيٰوةٌ উভয়টি شبه فعل তার متعلق মিলে مبتدأ مؤخر হলো। অতঃপর خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية হলো।

يٰاُولِى الْاَلْبَابِ : এখানে يا টি حرف نداء আর اُولِى الْاَلْبَابِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে منادى হলো, এখন منادى ও نداء মিলে جُمْلَة نِدَائِيَّة হয়েছে।

قوله لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ : এখানে لَعَلَّ শব্দটি حرف مشبهة بالفعل আর كُمْ টি لَعَلَّ-এর اسم এবং تَتَّقُوْنَ শব্দটি لعل-এর خبر অতঃপর لعل তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٨٥)

অনুবাদ (১৮৫) রমজান মাস, এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, এ কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত। [-এর উপকরণ] ও উজ্জ্বল বিবরণদায়ক ঐ কিতাবসমূহের, যা হেদায়েত এবং মীমাংসাকারী, সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি বর্তমান থাকে এই মাসে, তাকে অবশ্যই এই মাসে রোজা রাখতে হবে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা মুসাফির হয়, তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; আল্লাহ তোমাদের সাথে আছানির ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না, আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর– তোমাদেরকে হেদায়েত করার দরুন, আর যেন তোমরা শোকর কর।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ (١٨٦)

(১৮৬) আর যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তো নিকটেই আছি; আমি মঞ্জুর করি আবেদনকারীর আবেদন যখন আমার নিকট আবেদন করে, তাদেরও উচিত আমার বিধান মেনে নেওয়া আর আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা, আশা যে, তারা সুপথ লাভ করতে পারবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৫) شَهْرُ رَمَضَانَ রমজান মাস الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে هُدًى لِّلنَّاسِ এ কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত [-এর উপকরণ] وَبَيِّنٰتٍ ও উজ্জ্বল বিবরণদায়ক ঐ কিতাবসমূহের مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ যা হেদায়েত এবং মীমাংসাকারী فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি বর্তমান থাকে এই মাসে فَلْيَصُمْهُ তাকে অবশ্যই এই মাসে রোজা রাখতে হবে وَمَنْ كَانَ এবং যে ব্যক্তি হয় مَرِيْضًا পীড়িত اَوْ عَلٰى سَفَرٍ বা মুসাফির فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করেন بِكُمُ তোমাদের সাথে الْيُسْرَ আছানির وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর– عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ তোমাদেরকে হেদায়েত করার দরুন وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যেন তোমরা শোকর কর।

(১৮৬) وَاِذَا سَاَلَكَ আর যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عِبَادِيْ আমার বান্দা عَنِّيْ আমার সম্বন্ধে فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ তবে আমি তো নিকটেই আছি اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ আমি মঞ্জুর করি আবেদনকারীর আবেদন اِذَا دَعَانِ যখন আমার নিকট আবেদন করে فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ তাদেরও উচিত আমার বিধান মেনে নেওয়া وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ আর আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ আশা যে, তারা সুপথ লাভ করতে পারবে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

অনুবাদ : (১৮৭) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে রোজার রাত্রিতে স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া; কেননা তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণস্বরূপ; আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেদেরকে লিপ্ত করছিলে; যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন, সুতরাং এখন তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর এবং যা [অনুমতি প্রদানে] আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, [অবাধে] তার প্রস্তুতি কর, আর খাও ও পান কর, যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট সুবহে সাদেকের সাদা রেখা পৃথক হয়ে যায় কালো রেখা হতে, অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত্রি পর্যন্ত; আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিওনা যখন তোমরা ইতেকাফকারী হও মসজিদে, এগুলো আল্লাহর বিধান, সুতরাং তা লঙ্ঘনের কাছেও যেয়োনা, তদ্রূপ আল্লাহ স্বীয় বিধানসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন, আশা, তারা মুত্তাকী হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৭) أُحِلَّ لَكُمْ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে لَيْلَةَ الصِّيَامِ রোজার রাত্রিতে الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ কেননা তারা তোমাদের আবরণ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ এবং তোমরা তাদের আবরণস্বরূপ عَلِمَ اللَّهُ আল্লাহ জানতেন যে, أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেদেরকে লিপ্ত করছিলে; فَتَابَ عَلَيْكُمْ যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন وَعَفَا عَنكُمْ এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন فَالْآنَ সুতরাং এখন بَاشِرُوهُنَّ তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর وَابْتَغُوا এবং তার প্রস্তুতি কর مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ যা [অনুমতি প্রদানে] আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন وَكُلُوا وَاشْرَبُوا আর খাও ও পান কর, حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট পৃথক হয়ে যায় الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ সাদা রেখা مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ কালো রেখা হতে مِنَ الْفَجْرِ সুবহে সাদেকের ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ অতঃপর রোজা পূর্ণ কর إِلَى اللَّيْلِ রাত্রি পর্যন্ত وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিওনা وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ যখন তোমরা ইতেকাফকারী হও মসজিদে تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ এগুলো আল্লাহর বিধান فَلَا تَقْرَبُوهَا সুতরাং তা লঙ্ঘনের কাছেও যেয়োনা كَذَٰلِكَ তদ্রূপ يُبَيِّنُ اللَّهُ আল্লাহ বর্ণনা করেন آيَاتِهِ স্বীয় বিধানসমূহ لِلنَّاسِ মানুষের জন্য لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আশা, তারা মুত্তাকী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৬) قوله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কতিপয় লোক মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের প্রভু নিকটে না দূরে। যদি নিকটে হন তাহলে তাকে আমরা চুপি চুপি ডাকব। আর যদি দূরে হন তাহলে তাকে আমরা উচ্চ আওয়াজে ডাকব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৮৭) قوله أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, ইসলামের সূচনা লগ্নে নিয়ম ছিল ইফতারের পর শয্যা গ্রহণের আগ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া এবং স্ত্রী মিলন বৈধ। আর ঘুমানোর পর খাওয়া দাওয়া ও স্ত্রী মিলন নিষেধ ছিল পরের দিন ইফতার পর্যন্ত। তাতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম ভীষণ সমস্যায় পতিত হলেন। একদিনের ঘটনা-হযরত কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারাদিন কাজ করে ইফতারের সময় বাড়ি

ফিরলেন। স্ত্রীর নিকট খাবারের কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে না সূচক জবাব দিয়ে বলেন, একটু অপেক্ষা করুন। দেখি কোনো ব্যাবস্থা করতে পারি কিনা। এই বলে তিনি খাবার তালাশ করতে বের হলেন। এদিকে কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারা দিন কর্মজনিত ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে অবাক হয়ে বলেন তুমি একি কাজ করলে। এভাবে তিনি সারাদিন না খেয়ে পরের দিন রোজা রাখলেন দুপুর বেলায় তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। অনুরূপভাবে অনেক সাহাবী ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রী মেলামেশা করে মানসিক কষ্টে পতিত হতেন। –[ইবনে কাছীর]

আরেক দিনের ঘটনা, একদিন হযরত ওমর (রা.) হুজুর ﷺ -এর দরবার থেকে বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে দেখে বিবি সাহেবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি সহবাস করতে চাইলে বিবি বলে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, তুমি ঘুমিয়ে আছ আমি তো ঘুমাইনি। এই বলে তিনি সহবাস করলেন পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তিনি হুজুর ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর]

قوله وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ الخ (১৮৭) **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের সূচনালগ্নে ইতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রী মেলামেশা বৈধ ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করে তা নিষিদ্ধ করে দেন।

কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গে : কুরআনে কারীমের অন্য এক আয়াতে রয়েছে যে, আমি কুরআন মাজীদকে "শবে ক্বদরে" নাজিল করেছি। আর আলোচ্য আয়াতে রমজানে নাজিল করার কথা বলছেন। অতএব, সে শবে ক্বদর রমজান মাসেই ছিল। তাই আয়াতদ্বয়ে কোনো বিরোধ নেই। সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফূয হতে একবারেই রমজানের ক্বদর রাত্রে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর দুনিয়ার আসমান হতে ক্রমান্বয়ে তেইশ বৎসর ব্যাপী সমুদয় কুরআন মাজীদ প্রয়োজন অনুপাতে এক সূরা, দু'সূরা, এক আয়াত দু'আয়াত করে হুজুর ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ হয়।

ইমাম আহমদ ও তাবারানী ওয়াসেলা ইবনুল আসকা'র বর্ণনায় হুজুর ﷺ -এর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাগুলো রমজানের প্রথম রাত্রে, তাওরাত ষষ্ঠ রাত্রে, ইনজীল ত্রয়োদশ রাত্রে এবং কুরআন শরীফ চব্বিশতম রাত্রে নাজিল করা হয়েছিল।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থগুলো একসাথে এককালীন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যদিও শবে ক্বদরে একবারে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়, তবে তা পরে তেইশ বৎসরে রাসূলের নিকট প্রেরিত হয়।

মাহে রমজানের ফজিলত : পবিত্র কুরআন মাজীদ ও আসমানি অন্যান্য গ্রন্থসমূহ এই রমজান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে মাহে রমজানের ফজিলত ও মর্যাদা অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের সঙ্গে রমজান মাসের সুলভ ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এ মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের খেদমত, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করা পরম সৌভাগ্য ও মহান কর্তব্য।

রমজানের অর্থ : رَمَضَانُ الصَّائِمِ থেকে رَمَضَان শব্দটি নেওয়া হয়েছে। মারাত্মক ক্ষুধা তৃষ্ণায় পেট পুড়ে গেলে বলা হয় رَمَضَانُ الصَّائِمِ ; আবার প্রচণ্ড গরমকে اَلرَّمْضَاءُ বলা হয়। জাওহারী বলেন, ভাষাবিদগণ যখন পুরাতন ভাষা থেকে মাসের নামসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন তখন সময় এবং ঘটনাপ্রবাহকে সাক্ষী রেখেই মাসসমূহের নামকরণ করেছিলেন। রমজান মাসের নাম নির্ধারণ করার সময় প্রচণ্ড গরম থাকায় উক্ত নামই প্রযোজ্য হয়েছে।

কারো মতে এ মাসকে রমজান বলা হয়েছে এ কারণে যে, اِنَّهٗ يُرْمِضُ الذُّنُوْبَ –অর্থাৎ এ মাস পাপকে জ্বালিয়ে দেয়। এ মাসের সৎকাজের প্রভাব এত বেশি যে, এতে পাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

قوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসে উপস্থিত থাকবে সে যেন এ মাসের রোজা রাখে। জমহুরের মতে, যখন ব্যক্তি সফরে থাকবে তখন তার জন্য রোজা না রাখার সুযোগ রয়েছে। আর যদি মুকীম অবস্থায় থাকে, তবে রোজা রাখতেই হবে, ছেড়ে দেওয়া কোনো প্রকারেই বৈধ হবে না।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হলো রমজান মাসের দিনগুলো। আর এর ফজিলত হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানি কিতাব নাজিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। কুরআনও [প্রথম] এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহিফা রমজান মাসের ১লা তারিখে নাজিল হয়েছিল। আর রমজানের ৬ তারিখে তাওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জিল, এবং ২৪ তারিখে কুরআন নাজিল হয়েছে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'যাবূর' রমজানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জিল ১৮ তারিখে নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাজিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমজানের কোনো এক রাতে লওহে মাহফূজ থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেওয়া হলেও হুজুর আকরাম ﷺ-এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এই একটি মাত্র বাক্যে রোজা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিত ও বর্তমান থাকা। আরবি অভিধানে اَلشَّهْرُ অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমজান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি রমজান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ বাড়িতে বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমজান মাসের রোজা রাখা কর্তব্য। ইতঃপূর্বে রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মানসূখ বা রহিত করে দিয়ে রোজা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার জন্য রোজার যোগ্য অবস্থায় রমজান মাসের উপস্থিতি একটি শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমজান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরজ হবে। কাজেই রমজান মাসের মাঝে যদি কোনো কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোনো নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোজাগুলোই ফরজ হবে; বিগত দিনগুলোর রোজা কাজা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমজানের কোনো অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমজানের বিগত দিনগুলোর কাজা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েজ-নেফাসগ্রস্তা স্ত্রীলোক যদি রমজানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোনো অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে উঠে কিংবা কোনো মুসাফির যদি মুকিম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোজা কাজা করা তার পক্ষে জরুরি হবে।

মাসআলা : যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে ব্যহতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ, রমজান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোজা ফরজ না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফিকহবিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাজের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাজের হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ, যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে-সাদেক হয়ে যায়, সেদেশে এশার নামাজ ফরজ হয় না। –[শামী]

এর তাকাযা হলো এই যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয় সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হবে। রমজান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-ও 'ইমদাদুল ফতোয়া' গ্রন্থে রোজা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –আয়াতে রুগ্ণ কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তখন রোজা না রেখে; বরং সে সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোজা কাজা করে নিবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুগ্ণ কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমজানের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোজা ও ই'তেকাফের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ রোজা-সংক্রান্ত ইবাদতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোনো বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নিই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই।

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহকাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাছীর দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ আয়াতের দ্বারা রোজা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোজার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهٖ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ অর্থাৎ, রোজার ইফতার করার সময় রোজাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। –[আবূ দাউদ]

সে জন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইফতারের সময় বাড়ির সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

মাসআলা : এ আয়াতে فَإِنِّي قَرِيبٌ [আমি নিকটেই রয়েছি] বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়।

সাহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা : حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোজার শুরু এবং খানাপিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ শব্দটিও যোগ করে দেওয়া হয়েছে এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে সাদেক দেখা দেওয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও খানাপিনা করতে থাকবে; বরং খানা-পিনা এবং রোজার মধ্যে সুবহে সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরি মনে করা যেমন জায়েজ নয়, তেমনি সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একিন হয়ে যাওয়ার পর খানা পিনা করাও হারাম এবং রোজা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে সাদেক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সাহরীর শেষ সময়।

মাসআলা : উপরিউক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র, সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবহে সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমতো দেখার সুযোগ নেই, সুবহে সাদেকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারাণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সাহরী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসেবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময় সীমার মধ্যে সুবহে সাদেকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে একিন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন– এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানাপিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজন বশত খানাপিনা করে ফেলে তবে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু পরে তাহকীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানা-পিনা করেছে সে সময় সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোজার কাজা করা ওয়াজিব হবে। যেমন, রমজানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোজা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯ শে শাবানেই রমজানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোজা রাখেনি, তারা গুনাগাহার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোজা সকল ইমামের মতেই কাজা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেলল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গুনাহগার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোজা কাজা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্‌সাসের উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আজান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুবহে সাদেক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গুনাহগারও হবে এবং তার উপর সে রোজা কাজা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুবহে সাদেক এ সময়েই উদিত হয়েছিল, বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোজার কাজা করতে হবে।

ই'তিকাফ : ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোনো একস্থানে অবস্থান করা। কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারতি সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। فِي الْمَسْجِدِ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফ যে কোনো মসজিদেই হতে পারে। কেননা এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই ই'তিকাফ করা বৈধ। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে ই'তিকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফিকহবিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা 'মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা যেখানে নিয়মিত জামাতে নামাজ হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকানপাট সর্বত্রই বিছিন্নভাবে নামাজ পড়া জায়েজ এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

মাসআলা : ই'তিকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোজাদারদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েজ নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

রোজার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ : সর্বশেষ আয়াত تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোজার মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারোখা, এর ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেননা কাছে গেলেই সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোজা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করতে পারে, মুখের ভিতর কোনো ঔষধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মাকরূহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সাহরী খাওয়া শেষ করে দেওয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরি করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহর এই নির্দেশের পরিপন্থি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُجِيْبُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ معروف مضارع বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجَابَةُ মূলবর্ণ– (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি দোয়া কবুল করি।

دَعْوَةَ : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ– ডাকা, আহ্বান করা।

يَسْتَجِيْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ معروف مضارع বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক, তারা যেন আমার হুকুম কবুল করে।

كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِيَانُ মূলবর্ণ (خ . و . ن) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তোমরা খেয়ানত করছিলে।

حُدُوْدُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে حَدٌّ অর্থ– সীমারেখা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ : এখানে شَهْرُ رَمَضَانَ হলো مضاف ও مضاف اليه মিলে موصوف হয়েছে, الَّذِىْ হলো اسم موصول আর اُنْزِلَ হলো فعل مجهول ও فِيْهِ উভয়টি مجرور ও جار মিলে متعلق হলো, الْقُرْاٰنُ হলো ذو الحال আর هُدًى لِّلنَّاسِ হলো شبه فعل ও مِنَ আর شبه فعل মিলে متعلق ; معطوف عليه এবং واو টি حرف عطف আর بَيِّنٰتٍ হলো হরফে জার মা'তূফ আলাইহি وَ হরফের আতফ الْفُرْقَانِ মা'তূফ এখন মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো بينت-এর সাথে। শিবহে ফে'ল তার মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে حال হয়েছে, অতঃপর ذو ও حال মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة متعلق ও فعل مجهول ـ نائب فاعل মিলে ذو الحال হয়েছে। এবার نائب فاعل হয়ে صلة ; তারপর صلة ও اسم موصول মিলে صفت হয়েছে شَهْرُ رَمَضَانَ মওসূফের। এবার موصوف ও صفت মিলে উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। অতঃপর موصوف ও صفت মিলে উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

قوله اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ : এখানে اُحِلَّ হলো فعل مجهول ও لكم টি جار ও مجرور মিলে متعلق হলো اُحِلَّ ফে'ল-এর সাথে। لَيْلَةَ الصِّيَامِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه; نِسَآئِكُمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হলো। এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো الرفث শিবহে فعل-এর সাথে। الرَّفَثُ হলো شبه فعل আর اِلٰى হলো حرف جار ও হয়েছে। অবশেষে فعل مجهول তার نائب فاعل মিলে متعلق ও شبه فعل এবং مفعول فيه ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

অনুবাদ : (১৮৮) আর তোমরা একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না, এবং তা [-র মিথ্যা মকদ্দমা] -কে বিচারকদের নিকট দায়ের করো না এই উদ্দেশ্যে যে, [তার সাহায্যে] আত্মসাৎ করবে মানুষের সম্পত্তির অংশবিশেষ অন্যায়ভাবে অথচ তোমরা জানও।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

(১৮৯) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রের [প্রাকৃতিক] অবস্থা সম্বন্ধে; আপনি বলে দিন, এই চন্দ্র সময়-নির্ধারক যন্ত্রবিশেষ, মানুষের [বিভিন্ন বিষয়ের] জন্য এবং হজের জন্য; আর তা কোনো পুণ্যের কাজ নয় যে, ঘরসমূহে তার পশ্চাৎ দিক হতে প্রবেশ কর; বরং হারাম কাজ হতে বিরত থাকাতেই পুণ্য, আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর তার দরজা দিয়েই, এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা, তোমরা সফলকাম হবে।

وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

(১৯০) আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে, যারা [চুক্তি ভঙ্গ করে] তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং সীমালঙ্ঘন করো না নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৮) وَلَا تَأْكُلُوٓا আর তোমরা আত্মসাৎ করো না اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ একে অন্যের মাল بِالْبَاطِلِ অন্যায়ভাবে وَتُدْلُوا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ এবং তাকে বিচারকদের নিকট দায়ের করো না لِتَاْكُلُوا এই উদ্দেশ্যে যে, আত্মসাৎ করবে فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ মানুষের সম্পত্তির অংশবিশেষ بِالْاِثْمِ অন্যায়ভাবে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা জানও।

(১৮৯) يَسْـَٔلُوْنَكَ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْاَهِلَّةِ চন্দ্রের [প্রাকৃতিক] অবস্থা সম্বন্ধে; قُلْ আপনি বলে দিন هِیَ এই চন্দ্র مَوَاقِيْتُ সময়-নির্ধারক যন্ত্রবিশেষ لِلنَّاسِ মানুষের [বিভিন্ন বিষয়ের] জন্য وَالْحَجِّ এবং হজের জন্য وَلَيْسَ الْبِرُّ আর তা কোনো পুণ্যের কাজ নয় بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ যে ঘরসমূহে প্রবেশ কর مِنْ ظُهُوْرِهَا তার পশ্চাৎ দিক হতে وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى বরং হারাম কাজ হতে বিরত থাকাতেই পুণ্য وَاْتُوا الْبُيُوْتَ আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর مِنْ اَبْوَابِهَا তার দরজা দিয়েই وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা, তোমরা সফলকাম হবে।

(১৯০) وَقَاتِلُوْا আর তোমরা তাদেরকে সঙ্গে যুদ্ধ কর فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ যারা [চুক্তি ভঙ্গ করে] তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় وَلَا تَعْتَدُوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ (١٩١)

অনুবাদ : (১৯১) আর তাদের হত্যা কর যেখানে পাও অথবা তাদেরকে বহিষ্কৃত কর যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল, আর দুষ্কৃতি হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর, এবং তাদের সঙ্গে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, যদি তারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর, এই প্রকৃতির কাফেরদের এরূপই শাস্তি।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٢)

(১৯২) অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে [এবং ইসলাম গ্রহণ করে] তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (١٩٣)

(১৯৩) এবং তাদের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অবসান হয় এবং [তাদের] ধর্ম [খাঁটিভাবে] আল্লাহরই হয়ে যায়; অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে কারো প্রতি কঠোরতা করা হয় না অনাচারীদের ব্যতীত।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯১) وَاقْتُلُوْهُمْ আর তাদের হত্যা কর حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ যেখানে পাও وَاَخْرِجُوْهُمْ অথবা তাদেরকে বহিষ্কৃত কর مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল وَالْفِتْنَةُ আর দুষ্কৃতি اَشَدُّ গুরুতর مِنَ الْقَتْلِ হত্যা অপেক্ষা وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের নিকট حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ যদি তারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় فَاقْتُلُوْهُمْ তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর كَذٰلِكَ এরূপই جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ এই প্রকৃতির কাফেরদের শাস্তি।

(১৯২) فَاِنِ انْتَهَوْا অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(১৯৩) وَقٰتِلُوْهُمْ এবং তাদের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ যে পর্যন্ত না তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অবসান হয় وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ এবং [তাদের] ধর্ম [খাঁটিভাবে] আল্লাহরই হয়ে যায় فَاِنِ انْتَهَوْا অতঃপর যদি তারা বিরত হয় فَلَا عُدْوَانَ তবে কারো প্রতি কঠোরতা করা হয় না اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ অনাচারীদের ব্যতীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৮) قوله وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবদান ইবনে আশওয়া ইবনে হাযরামী নামের এক ব্যক্তি ইমরাউল কায়েস ইবনে আমের-এর উপর একটি জমির মালিকানার দাবি জানায়, অথচ তার কোনো সাক্ষী ছিল না। তখন রাসূল ﷺ বলেন, এমতাবস্থায় বিবাদীর শপথের উপর সিদ্ধান্ত নাও। তখন ইমরাউল কায়েস শপথ করার জন্য উদ্যত হলে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন– আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমাদের মধ্যে অনেক আছে ছল-চাতুর ব্যক্তি। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার নিকট বানোয়াট দাবি নিয়ে ধোঁকা দ্বারা মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রমাণ করবে, তাহলে আমি প্রকাশ্য প্রমাণানুযায়ী রায় দিব; কিন্তু তার জন্য তা হবে আগুনের টুকরা। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। [বুখারী, মুসলিম, রূহুল মা'আনী]

(১৮৯) قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) ও হযরত সালাবা (রা.) উভয়ে আনসারী সাহাবী ছিলেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে নতুন চাঁদ উদিত হলে প্রথমে সুতার ন্যায় চিকন দেখা যায়, অতঃপর তা বৃদ্ধি হতে হতে পূর্ণ গোলাকার হয়, আবার তা হ্রাস পেতে পেতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কি? তাদের প্রশ্নের জবাবে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

(১৮৯) قوله وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, জাহিলিয় যুগে অধিকাংশ গোত্রের মধ্যে এমন প্রথা ছিল যে, তারা সফরে বের হলে, কোনো কারণে সফর অসমাপ্ত থাকলে তারা বাড়ি ফিরে ঘরের সম্মুখের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত না; বরং ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করতো। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে জাহিলিয় প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। জাহিলিয় যুগের লোকেরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ঘরের পিছন দিক দিয়ে ঘরে ঢুকে তাদের স্ত্রীদের সাথে দেখা করে চলে যেত, সামনের দিক দিয়ে ঘরে ঢুকত না। এ ধরনের কু-প্রথাকে চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৯০) قوله وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবুল আলীয়া হতে বর্ণিত এ আয়াতটিই প্রথম আয়াত, যা মদিনার জীবনে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদের বিরুদ্ধে তিনিও যুদ্ধ করতেন। যারা বিরত থাকত তিনিও তাদের থেকে বিরত থাকতেন। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সূরায়ে তওবার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(১৯২) قوله فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** সপ্তম হিজরি সনে যখন নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির শর্তানুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাজা আদায়ের নিয়তে সাহাবীগণসহ মক্কাভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তারা জানতেন যে, কাফেরদের কাছে চুক্তির কোনো মূল্যই নেই। এমনও হতে পারে তারা সন্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীদের মনে এ আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে হেরেম শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। অপর আয়াতে সাহাবীগণের এ আশঙ্কার জবাব দেওয়া হয়েছে। হেরেম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু তারা যদি সেখানে আক্রান্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা জায়েজ।

সাহাবীদের মনে এ সন্দেহ ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং এটা সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এ মাসসমূহে কোথাও কারো সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তবে আমরা এখানে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব। তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যই এ আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতঃপূর্বে সূরা বাকারারই ১৬৮ তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল। "হে মানবমণ্ডলী! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

অনুরূপ সূরা নাহলে ইরশাদ হয়েছে–

"তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুজি দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসক হয়ে থাক।"

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূববর্তী জমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এ চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ [যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে] দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য আয়াতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়াও সূরা বাকারায় আরো ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকি ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আহিল্লাহ' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মতো হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল-তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদায়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসেব জেনে রাখা সহজতর হবে।

উত্তর প্রশ্নের অনুকূল নয় : উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বনবী ﷺ-কে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন দু'ধরনের হতে পারে। যথা– (১) চন্দ্র ছোট বড় হয় কেন? (২) চন্দ্রের উদ্দেশ্য কি?
যদি তাঁদের প্রশ্ন প্রথমটি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না। তখন উত্তর এই হবে যে, এটা দ্বারা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজির মৌলিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এ জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা অবান্তর। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে মহানবী ﷺ-কে বলেছিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত, তা হলো এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসেব জেনে রাখা সহজতর হবে। আর যদি দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্নের সাথে জবাবের পূর্ণ মিল দেখা যায়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

اَهِلَّة -এর অর্থ : اَلْاَهِلَّةَ শব্দটি اَلْهِلَالُ -এর বহুবচন। প্রত্যেক মাসের চাঁদকে এক একটি মনে করে এখানে বহুবচনের শব্দ নেওয়া হয়েছে। মাসের প্রথমে এবং শেষে আকাশে প্রকাশিত সরু চাঁদকে هِلَالٌ বলা হয়। আসমায়ীর মতে পূর্ণ রূপে গোলাকার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চন্দ্রকে هِلَالٌ বলা হয়। কারো মতে আকাশকে পূর্ণরূপে আলোকিত করার পূর্ব পর্যন্ত চন্দ্রকে هِلَالٌ বলা হয়। আর এ অবস্থা থাকে সাত দিন।

هلال -এর নামকরণ : চন্দ্রকে هِلَالٌ বলা হয়, هِلَالٌ অর্থ– উচ্চ শব্দ করা। যেহেতু নতুন চাঁদ দেখার সময় মানুষ সাধারণত উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চিৎকার দিলে আরবিতে বলা হয়– اِسْتَهَلَّ الصَّبِىُّ

قوله مَوَاقِيْتٌ لِلنَّاسِ -এর অর্থ : একথা দ্বারা চাঁদের হ্রাস ও বৃদ্ধির হিকমত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। مَوَاقِيْتُ শব্দটি مِيْقَاتٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– وَقْتٌ বা সময়। মানুষ নিজেদের ইবাদত ও লেনদেনের সময় ঠিক রাখার জন্য চন্দ্রকে ব্যবহার করে থাকে। যেমন– রোজা, ফিতর, হজ, গর্ভধারণের সময়, ইদ্দত, বাড়ি ভাড়া, কসম ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন– لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ

قوله وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, সকল প্রকার বিদ'আত, অপকর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদি পরিহার করাই যথেষ্ট নয়; বরং সাথে সাথে ভালো কাজ এবং শরিয়ত নির্দেশিত কাজকে আমলে আনতে হবে।

কিতাল সম্পর্কিত বক্তব্য : ওলামায়ে কেরামের মতে হিজরতের পূর্বে কিতাল নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে আল্লাহর নির্দেশ ছিল– فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا তারপর যখন মহানবী ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন দ্বিতীয় হিজরিতে আল্লাহ কিতালের নির্দেশ দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন। তা হলো– اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

وَلَا تَعْتَدُوْا -এর ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের অর্থ– "আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না"–এখানে সীমালঙ্ঘন বলতে নিম্নোক্ত বিষয় উদ্দেশ্য। যথা–

ক. অগ্রণী হয়ে অথবা বিনা কারণে হেরেমের সীমানায় বা অন্য কোথাও কাফেরদের উপর আক্রমণ করা।

খ. সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রের লোকদের হত্যা করা।

গ. কাফেররা যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার পরও তাদেরকে হত্যা করা।

ঘ. নারী, শিশু ও যুদ্ধে অপারগ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের হত্যা করা।

ঙ. আল্লাহ যেমনটি করতে বলেছেন তার চেয়ে বেশি করা।

উল্লিখিত সবগুলো কাজই নৈতিক বিচারে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা এ সীমালঙ্ঘন না করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিতালের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের স্বরূপ : যাদেরকে হত্যা না করতে বলা হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করলে সীমালঙ্ঘন হবে। যেমন– মহিলা, ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করা, যুদ্ধস্থলের আশপাশের ফলদার গাছ কাটা, গাছপালায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া, অকারণে বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত।

قوله مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : যেহেতু কাফেররা মহানবী ﷺ-কে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল তাই এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে সে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইবনে জারীর বলেন, এখানে মুহাজিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যেহেতু তারা তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল, সেহেতু তোমরাও তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দাও। আল্লাহর নবী তার প্রতিপালকের এই নির্দেশ পালন করেছিলেন যাতে একদিন মক্কা কাফের থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْفِتْنَةَ -এর অর্থ : ফেতনা শব্দের অর্থ হলো– পরীক্ষা, যাচাই। এ পরীক্ষা মানুষের জীবনে বিভিন্নভাবে আসে। কোনো সময় অধিক সুখ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আবার কখনো দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এতে মানুষ তাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার উদাহরণ পেশ করে থাকে। অপর পক্ষে দিশেহারা মানুষ এতে অকৃতকার্য হয়ে আখেরাতের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

اَلْفِتْنَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য : কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে فِتْنَة দ্বারা كُفْر ও شِرْك উদ্দেশ্য। কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিল মু'মিনগণ আবার কুফরির দিকে ফিরে যাক। এ কুফরির দিকে ফিরে যাওয়া হত্যা থেকেও মারাত্মক।

কারো মতে মসজিদে হারাম থেকে মানুষকে বিরত রাখাই হলো বড় ফিতনা। আর এটা হত্যা থেকেও মারাত্মক। কারো মতে এখানে ফিতনা দ্বারা দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উদ্দেশ্য। আবূ মুসলিম খোরাসানীর মতে এখানে فِتْنَة অর্থ– ظُلْم বা অপরাধ।

قوله وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -এর মর্মার্থ : হিজরতের পূর্বে মুসলমানদেরকে কাফেরদের মোকাবিলা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং সর্বত্র ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ আয়াত অবতীর্ণের পর সাহাবীদের মধ্যে এই ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদের হত্যা করাও নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদন কল্পে ইরশাদ হচ্ছে– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ অর্থাৎ এ কথাতো সর্বজনবিদিত ও সত্য যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরি ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদের ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী]

মসজিদে হারামে কিতালের হুকুম : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। একদল আলেমের মতে, আয়াতটি মুহকাম, তাই মসজিদে হারামে কিতাল অবৈধ। তবে যদি কেউ সেখানে কিতালে লিপ্ত হয়ে যায় তাকে প্রতিহত করা যাবে। অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মতে আয়াতটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে। মসজিদে হারামে কিতাল করা বৈধ। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবনে খাতালকে বায়তুল্লাহর গিলাফের সাথে ঝুলিয়ে থাকার পরও হত্যা করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ মূলত প্রথম বক্তব্যটিকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এটাই ঠিক। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার পূর্বেই মসজিদে হারামে কিতাল হারাম ছিল। আমাকে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে পূর্বের হুকুম বহাল থেকে যায়। আয়াতটি যদিও عَامٌ (আম), কিন্তু হাদীস দ্বারা তা খাছ করা যায়। এভাবে বলা যায় যে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ اِلَّا الْحَرَمَ

শরিয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌর হিসেবের গুরুত্ব : এ আয়াতে এতটুকু বুঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসেব জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেন দেন আদান-প্রদান এবং হজ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে– وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ;
এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসেব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসেব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দান রুজি-রোজগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।" –[বনী ইসরাঈল]

এই তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসেব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কুরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরিয়তে চন্দ্রমাসের হিসেবই নির্ধারিত। রমজানের রোজা, হজের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই 'রুইয়াতে হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা এই আয়াতে هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 'এটি মানুষের হজ ও সময় নির্ধারণের উপায়' বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও এই হিসেব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহর নিকট চন্দ্রমাসের হিসেবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক চন্দ্রমাসের হিসেব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চন্দ্রমাসের হিসেব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মুর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসেব সহজতর। কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসেব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসেব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসের হিসেব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ হিসেবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামি ইবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা শে'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসেবকে এই শর্তে নাজায়েজ বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসেব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চন্দ্রপঞ্জী ও চন্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ এরূপ করাতে রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশম্ভাবী।

মাসআলা : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا ['ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোনো পুণ্য নেই'] এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামি শরিয়ত প্রয়োজনীয় বা ইবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বা ইবাদত মনে করা জায়েজ নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরিয়তে জায়েজ রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গুনাহ। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরিয়তসম্মতভাবে জায়েজ থাকা সত্ত্বেও না-জায়েজ মনে করত এবং পাপ বলে গণ্য করত, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে [শরিয়তে যার কোনো আবশ্যকতাই ছিল না] নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

'বিদআত'-এর নাজায়েজ হওয়ার বড় কারণই এই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরজ-ওয়াজিবের মতোই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোনো কোনো জায়েজ বস্তুকে না-জায়েজ ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরিয়ত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েজকে না-জায়েজ মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বিদআত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম : গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদিনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও কিতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়। রবী' ইবনে আনাস (রা.)-এর উক্তি অনুসারে মদিনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্নাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরি করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হয় না– সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েজ নয়। কেননা আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণির লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফিকহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোনো নারী, বৃদ্ধ অর্থ ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোনো প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েজ। কারণ তারাও اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' এই আয়াতের আওতাভুক্ত। –[মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্‌সাস] যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে। وَلَا تَعْتَدُوْا [এবং সীমা অতিক্রম করো না]–বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ –[আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর, এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের কের দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।] হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-সহ সে ওমরার কাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে ওমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয়তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমরাও তার সমুচিত জবাব দেওয়ার অনুমতি থাকলো।

পুরো মক্কী জিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে ইরশাদ হলো– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –[এবং ফেতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ]। অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরি ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদেরকে ওমরা ও হজের মতো ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فِتْنَة [ফেতনা] শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী]

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরিয়তসিদ্ধ। আয়াতে এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে– وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ অর্থাৎ, 'মসজিদুল হারামের পাশ্ববর্তী এলাকায় তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাসআলা : হরমে-মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোনো হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েজ নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েজ। এই মর্মে সমস্ত ফিকহবিদগণ একমত।

মাসআলা : এ আয়াত দ্বারা আরো বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল হারামের পাশ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে মক্কায়'-ই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েজ।

সপ্তম হিজরি সনে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাজা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ (রা.) সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত ﷺ-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, কাফেরদের চুক্তি ও সন্ধির কোনোই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবীগণের এ আশঙ্কার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– মক্কার হরম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফেররা হরম–শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েজ।

সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব। তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার হরম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরিয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে [সম্মানিত মাসেও] যদি কাফেররা মুসলমানাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُدْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْلَاءُ মূলবর্ণ (د . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা যাও।

يَسْئَلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে।

مَوَاقِيْتُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مِيْقَاتٌ অর্থ– নির্ধারিত সময়।

ظُهُوْرِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ظَهْرٌ অর্থ- পিঠসমূহ।

لَا تَعْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

ثَقِفْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلثَّقْفُ মূলবর্ণ (ث . ق . ف) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পাও।

فِتْنَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فِتَن অর্থ– ফেতনা।

اَشَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلشِّدَّةُ মূলবর্ণ (ش . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বেশি কঠিন।

عُدْوَانَ : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ– জুলুম, অত্যাচার, জবরদস্তি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ : এখানে يَسْئَلُوْنَ ফে'ল, এতে هُمْ উহ্য সর্বনামটি ফা'য়েল, ك টি مفعول ; عَنِ الْاَهِلَّةِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো। সর্বশেষে ফে'ল, ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফি'ল। اَللهَ শব্দটি ইসমে ইন্না لَا يُحِبُّ ফে'ল, এতে هُوَ উহ্য সর্বনামটি তার ফা'য়েল, اَلْمُعْتَدِيْنَ মাফঊল। ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফঊল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে একক হিসেবে খবর। ইন্না তার ইসম ও খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ : এখানে اَلْفِتْنَةُ শব্দটি মুবতাদা, اَشَدُّ শিবহে ফে'ল, مِنَ الْقَتْلِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; শিবহে ফে'ল ও متعلق মিলে خبر হয়েছে, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اَللهَ টি اِنَّ এর اسم হয়েছে। غَفُوْرٌ ও رَحِيْمٌ প্রত্যেকটি اِنَّ এর خبر অবশেষে ان তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (١٩٤)

অনুবাদ (১৯৪) সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে আর এই সমস্ত সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু; সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করে, তোমরাও তার প্রতি উৎপীড়ন করবে, যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরুদের সঙ্গে থাকেন।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٩٥)

(১৯৫) আর তোমরা [জ্ঞানের সঙ্গে মালও] ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং [এই উভয় কাজ ত্যাগ করে] নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না, আর কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন কর, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদেরকে।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ

অনুবাদ : (১৯৬) আর হজ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপে পালন কর, অতঃপর যদি [শত্রু-ভীতির বা অসুস্থতাহেতু] তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কুরবানির জীব যা সহজসাধ্য হয় [যথারীতি জবাই করবে], এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত না পৌঁছে যায় কুরবানির জীব তার জবাইয়ের স্থানে; অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা তার মাথায় তাকলীফ থাকে, তবে ফিদিয়া দিবে রোজা অথবা সদকা অথবা জবাই দ্বারা,

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৪) الشَّهْرُ الْحَرَامُ সম্মানিত মাস بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ সম্মানিত মাসের বিনিময়ে وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ আর এই সমস্ত সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু; فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করে فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ তোমরাও তার প্রতি উৎপীড়ন করবে بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। وَاعْلَمُوْٓا এবং বিশ্বাস রাখ যে, اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরুদের সঙ্গে থাকেন।

(১৯৫) وَاَنْفِقُوْا আর তোমরা [জ্ঞানের সঙ্গে মালও] ব্যয় কর فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ এবং নিজেদেরকে নিজেরা নিক্ষেপ করো না اِلَى التَّهْلُكَةِ ধ্বংসের পথে। وَاَحْسِنُوْا আর কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন কর اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন الْمُحْسِنِيْنَ উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদেরকে।

(১৯৬) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আর হজ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপে পালন কর فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ অতঃপর যদি [শত্রু-ভীতির বা অসুস্থতাহেতু] তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ তবে কুরবানির জীব যা সহজসাধ্য হয়। وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করো না حَتّٰى যে পর্যন্ত না يَبْلُغَ الْهَدْيُ পৌঁছে যায় কুরবানির জীব مَحِلَّهٗ তার জবাইয়ের স্থানে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ অথবা তার মাথায় তাকলীফ থাকে فَفِدْيَةٌ তবে ফিদিয়া দিবে مِّنْ صِيَامٍ রোজা اَوْ صَدَقَةٍ অথবা সদকা اَوْ نُسُكٍ অথবা জবাই দ্বারা

فَاِذَآ اَمِنۡتُمۡ ۚ فَمَنۡ تَمَتَّعَ بِالۡعُمۡرَةِ اِلَى الۡحَجِّ فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡيِ ۚ فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ اِذَا رَجَعۡتُمۡ ؕ تِلۡكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنۡ لَّمۡ يَكُنۡ اَهۡلُهٗ حَاضِرِى الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ (١٩٦)

অনুবাদ : তারপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক, তখন যে ব্যক্তি ওমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে লাভবান হয়, তবে কুরবানির যে জীব সহজলভ্য হয় [জবাই করবে], অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয়, তবে [সে] রোজা রাখবে তিন দিন হজের সময় আর সাত দিন [রোজা রাখবে] যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে; এই দশ পূর্ণ হলো, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান না করে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

اَلۡحَجُّ اَشۡهُرٌ مَّعۡلُوۡمٰتٌ ۚ فَمَنۡ فَرَضَ فِيۡهِنَّ الۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوۡقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الۡحَجِّ ؕ وَمَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يَّعۡلَمۡهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوۡا فَاِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوٰى ۫ وَاتَّقُوۡنِ يٰۤاُولِى الۡاَلۡبَابِ (١٩٧)

(১৯৭) হজের মাসগুলো সুবিদিত, অতএব, যে ব্যক্তি এই মাসগুলোর মধ্যে হজ করা স্থির করে নেয়, অতঃপর হজে না অশ্লীলতা আছে এবং না অসৎ কাজ এবং না ঝগড়া-বিবাদ, আর তোমরা যে নেককাজ করবে আল্লাহ তা অবগত হন, আর পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিও, কেননা পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা [ভিক্ষাবৃত্তি হতে] বেঁচে থাকা, আর হে জ্ঞানীগণ! আমাকে ভয় করতে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

فَاِذَآ اَمِنۡتُمۡ তারপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক فَمَنۡ تَمَتَّعَ তবে যে ব্যক্তি লাভবান হয় بِالۡعُمۡرَةِ اِلَى الۡحَجِّ ওমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡيِ তবে কুরবানির যে জীব সহজলভ্য হয় [জবাই করবে] فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয় فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তবে [সে] রোজা রাখবে তিন দিন فِى الۡحَجِّ হজের সময় وَسَبۡعَةٍ اِذَا رَجَعۡتُمۡ আর সাত দিন যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে تِلۡكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ এই দশ পূর্ণ হলো ذٰلِكَ এটা لِمَنۡ لَّمۡ يَكُنۡ اَهۡلُهٗ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ না করে حَاضِرِى الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعۡلَمُوۡۤا এবং জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

(১৯৭) اَلۡحَجُّ اَشۡهُرٌ مَّعۡلُوۡمٰتٌ হজের মাসগুলো সুবিদিত فَمَنۡ فَرَضَ অতএব, যে ব্যক্তি স্থির করে নেয় فِيۡهِنَّ الۡحَجَّ এই মাসগুলোর মধ্যে হজ করা فَلَا رَفَثَ অতঃপর না অশ্লীলতা আছে وَلَا فُسُوۡقَ এবং না অসৎ কাজ وَلَا جِدَالَ এবং না ঝগড়া-বিবাদ فِى الۡحَجِّ হজে وَمَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ আর তোমরা যে নেককাজ করবে يَّعۡلَمۡهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা অবগত হন وَتَزَوَّدُوۡا আর পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিও فَاِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ কেননা পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা التَّقۡوٰى [ভিক্ষাবৃত্তি হতে] বেঁচে থাকা واتقون আর আমাকে ভয় করতে থাক يٰۤاُولِى الۡاَلۡبَابِ হে জ্ঞানীগণ!।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৪) اَلشَّهۡرُ الۡحَرَامُ بِالشَّهۡرِ الۡحَرَامِ وَالۡحُرُمٰتُ قِصَاصٌ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপন হওয়ার পরের বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওমরাহ-এর কাজা আদায় করতে মক্কায় যান তখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, কাফেরগণ মুসলমানদেরকে ওমরাহ আদায় করতে বাধা প্রদান করবে। তখন মুসলমানগণ এতে বিচলিত হয়ে পড়েন যে, কিভাবে নিষিদ্ধ মাসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে? তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৯৫) وَاَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَلَا تُلۡقُوۡا اِلَی التَّهۡلُکَۃِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পর যখন আরবের সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয় এবং দিকে দিকে শিরক ও কুফর উৎখাত হয়ে ঈমানের জয় জয়কার ধ্বনি উত্থিত হয় তখন একদা তিনি আত্মতৃপ্তিতে বলেন, "এক্ষণে মহান আল্লাহ ইসলামকে সর্বত্র বিজয়ী করেছেন, ফলে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আমরা শঙ্কাহীন হয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে গৃহে ফিরে এসেছি। এমতাবস্থায় আমরা নির্বিঘ্নে গৃহে অবস্থান করতে পারব এবং এতদিনের অনুপস্থিতিতে এলোমেলো সংসার গুছিয়ে নিতে সুযোগ পাব"। এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

(১৯৬) وَاَتِمُّوا الۡحَجَّ وَالۡعُمۡرَۃَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنۡ اُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا اسۡتَیۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡیِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ষষ্ঠ হিজরিতে নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর মক্কার কাফেররা তাদেরকে বাঁধা প্রদান করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[কাশশাফ, বায়যাবী]

(১৯৭) اَلۡحَجُّ اَشۡهُرٌ مَّعۡلُوۡمٰتٌ ۚ فَمَنۡ فَرَضَ فِیۡهِنَّ الۡحَجَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একসময়ে একটি ইয়েমেনী কাফেলা হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর উপর ভরসাকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পথের খরচ ও পাথেয় ছাড়াই চলতে শুরু করে। মক্কায় পৌঁছে তারা যখন প্রয়োজনীয় কার্যাদি ও খাদ্য পানীয়ের অভাব মিটাতে চাইল, আর টাকার অভাবে তা করতে না পেরে ওরা লোকজনের কাছে হাত পাততে শুরু করল, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাজিল করেন। বলা হলো যে, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা পাথেয় অর্জন করে প্রয়োজনীয় সম্বল সাথে নিয়ে হজের জন্য বের হবে, যাতে কারো গলগ্রহ হতে না হয়। অন্যথা তোমাদেরকে পরের নিকট হাত পাততে হবে, যা রীতিমতো تَقْوٰی -এর পরিপন্থি কাজ।

জিহাদে অর্থ ব্যয় : وَاَنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ [এবং তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর]– এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজন মতো ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরজ করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফিকহশাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরজ জাকাত ব্যতীত আরা এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরজ; কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোনো খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোনো নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই; বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আর যদি প্রয়োজন না হয়; তবে কিছুই ফরজ নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

قوله وَلَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّهۡلُکَۃِ [এবং স্বহস্তে নিজেকের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না] আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, "ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" বলতে এক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাদাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাস্‌সাস ও ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাজিল হলো। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হুযায়ফা (রা.), কাতাদা (রা.) এবং মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র.) প্রমুখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেছেন– পাপের কারণে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

ইমাম জাস্‌সাস (র.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত সমস্ত নির্দেশই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ –এই বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন 'ইহসান' اِحْسَانٌ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইহসান দু'রকম : ১. ইবাদতে ইহসান, ও ২. দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান। ইবাদতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাদীসে জিবরাঈল' –এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে [মু'আমালাত ও মু'আশারাত] ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের জন্য যাকিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা না-পছন্দ করবে।" –[মাযহারী]

হজ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন, এবং ইসলামের ফারায়েজ বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। কুরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হিজরি তৃতীয় বছর, যে বছর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ ফরজ করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

এ আয়াতেই হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আটটি আয়াতের প্রথম আয়াত وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ, মুফাসসিরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যা ৬ষ্ঠ হিজরি সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ ফরজ হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো হজ ও ওমরার কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহকাম : সূরা আলে ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ ফরজ করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোনো আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরজ কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো কথাই বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে যে, কোনো লোক যদি ইহরামের মাধ্যমে হজ অথবা ওমরা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন– সাধারণ নফল নামাজ-রোজার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরা ওয়াজিব কিনা তা বুঝায় না; বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বুঝায়।

ইবনে কাছীর হযরত জাবের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুজুর! ওমরা কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেন, ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভালো। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ ওমরাকে ওয়াজিব বলেননি; সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ অথবা ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোনো ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোনো অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হরমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, ইহরামের ফিদিয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানি কর। কুরবানি করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াতে وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ -এ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহরাম খোলার শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয়, যতক্ষণ না ইহরামকারীর কুরবানি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হরমের এলাকায় পৌঁছে কুরবানির পশু জবাই করা। তা নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে। এ আয়াতে অপারগতা অর্থ হচ্ছে– রাস্তায় কোনো শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমাম অসুস্থতাকেও অপারগতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রাসূল ﷺ-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানি করেই ইহরাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ বা ওমরা কাজা করা ওয়াজিব। যেমন হুজুর ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লিখিত ওমরার কাজা আদায় করেছিলেন।

এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহরাম ভঙ্গ করার নিদর্শনা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসেবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ ও ওমরা আদায় করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোনো অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে?

ইহরাম অবস্থায় কোনো কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কি করতে হবে? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ –আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের লোম কাটা জায়েজ। কিন্তু এর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোজা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানি করা। কুরবানির জন্য হরমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোজা রাখা বা সদকা দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোনো স্থানে আদায় করা চলে। কুরআনের শব্দের মধ্যে রোজার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোনো পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলে কারীম সাহাবী কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন– তিনটি রোজা এবং ছয়জন মিসকিনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' গম দিতে হবে। –[বুখারী]

হজ মৌসুমে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করার নিয়ম : ইসলাম পূর্বযুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল, হজের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ, শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য এ সময়ের মধ্যে হজ ও ওমরা একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ তাদের পক্ষে হজের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরার জন্য দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমনি অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ করতে আসে, তাদের জন্য দুটিকেই একত্রে আদায় করা জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্য পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ যাত্রীগণ যিনি যেদিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ অথবা ওমরার নিয়তে ইহরাম করা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গুনাহর কাজ। যেমন, বলা হয়েছে– لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর অর্থ তাই। অর্থাৎ,যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্য হজ ও ওমরা হজের মাসে একত্রে করা জায়েজ।

অবশ্য যারা হজের মৌসুমে হজ ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দুটি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানি করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তারা বকরি, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোনো একটি পশু কুরবানি করবে। কিন্তু যাদের কুরবানি করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই তারা দশটি রোজা রাখবে। হজের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ সমাপনের পর সাতটি রোজা রাখতে হবে। এ সাতটি রোজা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোজা পালন করতে না পারে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্য কুরবানি করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরম শরীফে কুরবানি আদায় করবে।

তামাত্তু' ও কেরান : হজের মাসে হজের সাথে ওমরাকে একত্রিকরণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম করা। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে কেরান' বলা হয়। এর ইহরাম হজের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজ-কর্ম শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ই জিলহজ তারিখে মিনা যাওয়ার প্রাক্কালে হরম শরীফের মধ্যেই ইহরাম বেঁধে নিবে। শরিয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'হজ্জে তামাত্তু' কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ ও ওমরার আহকামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ : শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে– /

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ ও ওমরাকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ ও ওমরার নিয়মাবলি জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মোস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

হজসংক্রান্ত ৮টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাসআলাসমূহ : اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'আশহুরুন' শব্দটি শাহরুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, মাস। পূববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ অথবা ওমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দুটির মধ্যে, ওমরার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, হজের ব্যাপারটি ওমরার মতো নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস রয়েছে সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের দশ দিন। হযরত আবু উমামাহ ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে তাই বর্ণিত হয়েছে। –[মাযহারী]

হজের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধা জায়েজ নয়। কোনো কোনো ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজের ইহরাম করলে হজ আদায়ই হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে হজ অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরুহ হবে। –[মাযহারী]

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ – এ আয়াতে হজের ইহরামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব তা হচ্ছে 'রাফাস' 'ফুসূক' ও 'জিদাল'। رَفَثٌ 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষাঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইহরাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়।

فُسُوْق 'ফুসূক'-এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কুরআনের ভাষায় নির্দেশ লঙ্ঘন বা নাফরমানি করাকে 'ফুসূক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসূক' বলে। তাই অনেকে এ স্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) 'ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন– সে সকল কাজ-কর্ম যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ ইহরামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে না-জায়েজ ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ইহরামের জন্য নিষেধ ও না-জায়েজ- তা হচ্ছে– ছয়টি–

১. স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। ২. স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেওয়া। ৩. নখ বা চুল কাটা। ৪. সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইহরাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। ৫. সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। ৬. মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যও না-জায়েজ।

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও 'ফুসূক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহরাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর কোনো ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ করতেই হবে। এজন্যই فلا رفث শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

جِدَالٌ শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজন্যই বড় রকমের বিবাদকে جِدَالٌ বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোনো কোনো মুফাসসির এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে হজ ও ইহরামের সম্পর্কে হেতু এখানে 'জিদাল' এর অর্থ করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করত; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করত, আবার কেউ কেউ মুযদালিফায় অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করত। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করত না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করত। এমনিভাবে হজের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করত। কেউ কেউ জিলহজ মাসে হজ করত, আবার কেউ কেউ জিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এ জন্য একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করত। তাই কুরআনে কারীম وَلَا جِدَالَ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে। আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরজ এবং মুযদালিফায় অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ আদায় করতে হবে, এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসূক ও জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহরামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইক লাব্বাইক' বলা হচ্ছে। ইহরামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন ইবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানির কাজ।

কুরআনের ভাষালঙ্কার : فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ আয়াতের শব্দগুলো নেতিবাচক। হজের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা; যার জন্য لَا تَرْفُثُوْا وَلَا تَفْسُقُوْا وَلَا تُجَادِلُوْا শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এখানে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজের মধ্যে এসব বিষয়ের কোনো অবকাশ নেই। এমনকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না। وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ; ইহরামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লিখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজের পবিত্র সময়ে ও পুতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহর জিকির ও ইবাদত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেওয়া হবে।

قوله وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى : এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ ও ওমরা করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়; বরং আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা। হুজুর ﷺ থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মুর্খতারই নামান্তর।

হজের অর্থ ও তার প্রকারভেদ :

হজের সংজ্ঞা : হজের আভিধানিক অর্থ-দৃঢ়সংকল্প করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় বাইতুল্লাহ শরীফ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ইহরামের সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জেয়ারত করাকে হজ বলে।

হজ তিন প্রকার– (১) হজ্জে ইফরাদ (২) হজ্জে তামাত্তু' (৩) হজ্জে কিরান।

(১) হজ্জে ইফরাদ : নির্ধারিত স্থান (মীকাত) হতে শুধুমাত্র হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে, মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে হজের যাবতীয় কার্যাবলি নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট স্থানে সমাধা করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে। সাধারণত বদলী হজ যারা করেন, তাঁদেরকে ইফরাদ হজের নিয়ত করতে হয়। তবে হজে কিরান বা হজে তামাত্তু' করতে হলে যিনি হজ করাচ্ছেন বা অসিয়তকারীর অনুমতিক্রমে করতে পারেন। ইহ্রাম অর্থ–হারাম করা, নিষিদ্ধ করা। হাজীগণ যখন হজ

বা ওমরা অথবা উভয়ের দৃঢ় নিয়ত করে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে তখন তার উপর কতিপয় হালাল ও মোবাহ বস্তু ও ইহরামের কারণে হারাম হয়ে যায়। যেমন নামাজের মধ্যে ও তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা কতিপয় হালাল জিনিস ও হারাম হয়ে যায়। এ জন্য ইহরামকে ইহরাম বলা হয়।

(২) হজ্জে তামাত্তু' : তামাত্তু' -এর আভিধানিক অর্থ– উপকৃত হওয়া, লাভবান হওয়া, সুবিধা ভোগ করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় হজের মাসসমূহের মধ্যে (অর্থাৎ শাওয়াল, যুলকাদাহ ও যুলহাজ্জার ১ম দশ দিনের মধ্যে) মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরার কার্যাবলি সমাধা করার পর মক্কা মুকাররামাহ পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজের কার্যাদি সম্পন্ন করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে।

(৩) হজ্জে ক্বিরান : হজ ও ওমরা উভয়টির একসঙ্গে ইহরাম বেঁধে প্রথমত ওমরার কার্যাবলি সমাধা করাকে হজে ক্বিরান বলে। এখানে মীকাতের ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে, ক্বিরান হজ ও তামাত্তু'কারী বহিরাগত হবে, মক্কাবাসী হবে না। কেননা মক্কাবাসীদের জন্য ক্বিরান হজ ও তামাত্তু' হজ নেই।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জে ক্বিরানই সবচেয়ে উত্তম হজ। তারপর তামাত্তু', অতঃপর ইফরাদ।

হজের ফরজসমূহ : হজের ফরজ তিনটি : (১) ইহরাম বাঁধা। (২) ৯ই যিলহিজ্জাহ তারিখের দ্বি-প্রহরের পর হতে পরবর্তী সুবহে সাদেকের মধ্যে আরাফার ময়দানে কিছু সময় অবস্থান করা। (৩) তওয়াফে জিয়ারত করা।

হজের ওয়াজিবসমূহ : হজের ওয়াজিব ৫টি ঃ (১) মুযাদালিফাহ নামক স্থানে অবস্থান করা। (২) রমী করা বা শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। (৩) দমে শোকর বা হজের কুরবানি আদায় করা। (৪) মাথা মুণ্ডন করা বা মাথার চুল কাটা। (৫) সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করা।

ওমরার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ :

ওমরার সংজ্ঞা : ওমরা শব্দের অর্থ–মনস্থ করা, উপাসনা করা, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলির দ্বারা অনির্দিষ্ট সময়ে মীকাত হতে ইহ্রাম বেঁধে যথারীতি তওয়াফ, সা'ঈ ও মাথা মুণ্ডন করাকে ওমরা বলে। সক্ষম ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার ওমরা পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

ওমরার প্রকার : ওমরাহ দু'প্রকার ঃ (১) হজের ওমরা এবং (২) নফল ওমরা।

ওমরার ফরজ : ওমরার ফরজ দু'টি ঃ (১) মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা ও (২) ওমরা করার নিয়ত করা।

ওমরার ওয়াজিব : ওমরার ওয়াজিব দু'টি ঃ (১) সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়দ্বয়ে সাত বার সা'ঈ করা। (২) মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা।

হজ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য :

(১) হজ اَمْرٌ مُطْلَقٌ -এর দ্বারা ফরজে আইন, পক্ষান্তরে ওমরা হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। (২) হজের ফরজ তিনটি আর ওমরার ফরজ দু'টি। (৩) হজের জন্য সময় নির্দিষ্ট, আর ওমরার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। (৪) হজের মধ্যে মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফায় অবস্থান করা রয়েছে কিন্তু ওমরাতে তা নেই। (৫) হজের মধ্যে তওয়াফে বিদা রয়েছে কিন্তু ওমরাতে তা নেই।

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ -এর বিশ্লেষণ : হজের ইহরাম বাঁধার পর হালাল হওয়ার পূর্বে হজ কার্য পালন অবস্থায় তিনটি রোজা রাখবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইহরাম ও হালাল হওয়ার মধ্যবর্তীতে এ রোজা রাখবে। তবে উত্তম হচ্ছে জিলহজ মাসের ৭ম, ৮ম, ও ৯ম তারিখে রোজা রাখা। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে কুরবানির দিন ও আইয়ামে তাশরীকে এ রোজা রাখা জায়েজ নেই। আর বাকি সাতটি রোজা বাড়ি ফিরার পর আদায় করবে।

فِدْيَةٌ -এর পরিমাণ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোনো খানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তাহলে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল কাটা জায়েজ। কিন্তু এর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোজা রাখা অথবা সদকা দেওয়া অথবা কুরবানি করা। কুরবানির জন্য হেরেমের সীমা-রেখা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু রোজা রাখা এবং সদকা

দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোনো স্থানে আদায় করা যেতে পারে। কুরআনের শব্দের মধ্যে রোজার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোনো পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন। তিনটি রোজা এবং ছয়জন মিসকিনকে মাথা পিছু অর্ধ সা অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম দিতে হবে। আর একটি ছাগল বা দুম্বা কুরবানি করতে হবে। তবে উত্তম হলো গরু অথবা উট কুরবানি করা।

إِحْصَارٌ -এর অর্থ : إِحْصَارٌ শব্দের অর্থ আটক করা, অবরোধ করা, বাধা প্রাপ্ত হওয়া। আটককৃত ব্যক্তি কুরবানির জানোয়ার জবাই করে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হতে পারে। শত্রুর কারণে বা রোগের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলেও একটি কুরবানি করতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِعْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে অতিক্রম করে।

لَاتُلْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিক্ষেপ করো না।

اَتِمُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْمَامُ মূলবর্ণ (ت . م . م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা পূর্ণ কর।

اُحْصِرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَارُ মূলবর্ণ (ح . ص . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও।

اَمِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা নিরাপদ হবে।

لَمْ يَجِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجُدُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– সে পায়নি।

لَمْ يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ ـ اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে হয়নি।

اتقوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ : এখানে اَعْلَمُوْا ফে'ল যমীরে انتم ফা'য়েল, اَنَّ হরফে মোশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَللّٰهَ শব্দটি اَنَّ-এর اسم আর مَعَ الْمُتَّقِيْنَ তার خبر ; অতঃপর اَنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে جُمْلَةً اِسْمِيَّةً হয়ে مفعول অবশেষে فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَةً فِعْلِيَّةً اِنْشَائِيَّةً হয়েছে।

قوله وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ : এখানে لَا تُلْقُوْا হলো فعل, انتم হলো فاعل, আর بِاَيْدِيْكُمْ প্রথম متعلق আর اِلَى التَّهْلُكَةِ হলো দ্বিতীয় متعلق ; এবার فعل - فاعل ও উভয় متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ : এখানে اَتِمُّوا ফে'ল এতে انتم যমীর ফা'য়েল, اَلْحَجَّ হলো معطوف عليه আর و হলো حرف عطف এবং العمرة হলো معطوف ;এবার معطوف عليه ও معطوف به মিলে مفعول হয়েছে। لِلّٰهِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; অবশেষে فعل - فاعل - مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خبرية হয়েছে।

قوله وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ : এখানে واو টি হরফে আতফ, لَا تَحْلِقُوْا ফে'ল, এতে انتم যমীর فاعل; رُءُوْسَكُمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول به হয়েছে। حَتّٰى হরফে জার يَبْلُغَ ফে'ল, اَلْهَدْىُ ফা'য়েল, محله মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول হয়েছে। এখন فعل - فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে একক হিসেবে مجرور হলো ও جار মিলে متعلق অবশেষে فعل - فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়েছে।

قوله اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ : এখানে اَلْحَجُّ মুবতাদা, اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ : এখানে উহ্য اِتَّقُوْا পদটি فعل এতে انتم উহ্য সর্বনামটি তার فاعل হয়েছে। نِ টি وقاية এখানে ى متكلم مفعول ; সুতরাং فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে جواب نداء অতঃপর يَا টি حرف نداء আর اُولِى পদটি مضاف এবং اَلْاَلْبَاب টি مضاف اليه, এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে منادى সুতরাং حرف نداء তার منادى ও جواب نداء মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ (১৯৮) এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে, জীবিকা অন্বেষণ কর, যা তোমাদের প্রভু-প্রদত্ত, অতঃপর তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনকালে মাশআরে হারামের নিকট [মুযদালিফায়] আল্লাহর জিকির কর এবং [তদ্রূপ] জিকির কর যেরূপ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আর প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বে তোমরা নিরেট অজ্ঞ ছিলে।	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۗلِّيْنَ (١٩٨)
(১৯৯) অতঃপর তোমরা অবশ্যই ঐ স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর, যেখান হতে অন্যান্য লোক যেয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।	ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٩)
(২০০) অনন্তর যখন তোমরা হজের যাবতীয় কাজ পূর্ণ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদেরকে স্মরণ করে থাক; বরং আল্লাহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত; সুতরাং কেউ কেউ এরূপ আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে [যা কিছু দেওয়ার] ইহলোকেই প্রদান করুন, আর এরূপ লোক পরলোকে কোনো অংশ পাবে না।	فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۗءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۭ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠)
(২০১) আর কতক লোক এমন আছে– যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহলোকেও কল্যাণ দান করুন এবং পরলোকেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করুন।	وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)

النصف

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে। اَنْ تَبْتَغُوْا অন্বেষণ কর فَضْلًا জীবিকা مِّنْ رَّبِّكُمْ যা তোমাদের প্রভু-প্রদত্ত فَاِذَآ اَفَضْتُمْ অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে مِّنْ عَرَفٰتٍ আরাফাত হতে فَاذْكُرُوا اللّٰهَ আল্লাহর জিকির কর عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ মাশআরে হারামের নিকট [মুযদালিফায়] وَاذْكُرُوْهُ এবং [তদ্রূপ] জিকির কর كَمَا هَدٰىكُمْ যেরূপ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ যদিও আর প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বে তোমরা ছিলে لَمِنَ الضَّاۗلِّيْنَ নিরেট অজ্ঞ।

(১৯৯) ثُمَّ اَفِيْضُوْا অতঃপর তোমরা অবশ্যই ঐ স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ যেখান হতে অন্যান্য লোক যেয়ে প্রত্যাবর্তন করে وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(২০০) فَاِذَا قَضَيْتُمْ অনন্তর যখন তোমরা পূর্ণ কর مَّنَاسِكَكُمْ হজের যাবতীয় কাজ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ তখন আল্লাহকে স্মরণ কর كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۗءَكُمْ যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদেরকে স্মরণ করে থাক اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا বরং আল্লাহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত فَمِنَ النَّاسِ সুতরাং কেউ কেউ এরূপ আছে مَنْ يَّقُوْلُ যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু! اٰتِنَا আমাদেরকে প্রদান করুন فِي الدُّنْيَا ইহলোকেই وَمَا لَهٗ আর এরূপ লোক পাবে না فِي الْاٰخِرَةِ পরলোকে مِنْ خَلَاقٍ কোনো অংশ।

(২০১) وَمِنْهُمْ আর কতক লোক এমন আছে– مَّنْ يَّقُوْلُ যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু! اٰتِنَا আমাদেরকে দান করুন فِي الدُّنْيَا ইহলোকেও حَسَنَةً কল্যাণ وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً এবং পরলোকেও কল্যাণ দান করুন وَّقِنَا এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন عَذَابَ النَّارِ দোজখের আজাব হতে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)

অনুবাদ : (২০২) এরূপ লোকেরা বড় অংশ পাবে তাদের এই আমলের দরুন এবং আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হিসাব নিবেন।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

(২০৩) আর আল্লাহর জিকির কর কয়েক দিন পর্যন্ত, অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে দুই দিনের মধ্যে, তার উপর কোনো পাপ নেই, আর যে দেরি করবে তার উপরও কোনো পাপ নেই– যে [আল্লাহর] ভয় রাখে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে সমবেত হতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০২) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ এরূপ লোকেরা বড় অংশ পাবে। مِّمَّا كَسَبُوا তাদের এই আমলের দরুন وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ এবং আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হিসাব নিবেন।

(২০৩) وَاذْكُرُوا اللَّهَ আর আল্লাহর জিকির কর فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ কয়েক দিন পর্যন্ত فَمَن تَعَجَّلَ অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে فِي يَوْمَيْنِ দুই দিনের মধ্যে فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তার উপর কোনো পাপ নেই وَمَن تَأَخَّرَ আর যে দেরি করবে فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তার উপরও কোনো পাপ নেই– لِمَنِ اتَّقَىٰ যে [আল্লাহর] ভয় রাখে وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে সমবেত হতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** ইমাম বুখারী ও রূহুল মা'আনী তাফসীর প্রণেতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় প্রাক ইসলামি যুগে ওকায, মুজান্না ও যুলমাজায নামে তিনটি আন্তদেশীয় বাজার ছিল। সেসব বাজারে হজের মৌসুমে জাহেলিয়াতের যুগে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে অন্যায় কাজ মনে করা হতো। তাই সাহাবীরা এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তাদের এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে এসে আরজ করল, উট ভাড়া দেওয়া আগ থেকেই আমার ব্যবসা। হজের মৌসুমে কেউ কেউ আমার উট ভাড়া নেয়। আমিও তাদের সাথে হজে যাই এবং হজ করে আসি। তাতে কি আমার হজ জায়েজ হবে না? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, রাসূল ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে এমন প্রশ্ন করেছিল; কিন্তু তিনি তার প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রদান করেননি। এ সময় রাসূলের উপর لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ এ আয়াতটি নাজিল হয়। পরে তিনি ঐ লোকটিকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ তোমার হজ শুদ্ধ হবে।

(১৯৯) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। জাহেলিয়াতের যুগেও হজ করার প্রচলন ছিল। হজের সময় সকল আরববাসী আরাফার ময়দানে অবস্থান করত। কুরাইশগণ নিজেদের বড় মনে করে হজ ক্রিয়ায় আরাফাহ পর্যন্ত যেত না; বরং মুযদালিফায় গিয়ে অবস্থান করত এবং সেখান থেকে ফিরে আসতো। যখন ইসলামে হজ ফরজ হয় তখন মুসলমানদের মধ্যে জাহিলিয়ার সে নিয়ম নিষিদ্ধ ঘোষণায় উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

(২০০) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর লোবানুন নুকূল গ্রন্থে এবং সাইয়েদ আলূসী তাঁর তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহেলী যুগে আরবরা হজের অনুষ্ঠানাদি সমাপন করে মসজিদে মিনা এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে জামরার নিকট একত্রিত হলে, নিজেদের পিতৃপুরুষদের বীরত্ব গাঁথা, কৃতিত্ব, মহত্ত্ব ও দানশীলতার কথা বর্ণনা করত এবং গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করত। তাদের এ ধরনের জাহেলী কাজকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন এবং পিতৃ পুরুষের স্মরণের স্থলে তাঁকে স্মরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আরবের কোনো কোনো জাতির এমন নীতি ছিল যে, যখন তারা মিনায় একত্রিত হতো তখন দোয়া করত, হে প্রভু! এ বছর আমাদের খুব স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশস্ততা দান কর, অভাব-অনটন দিও না, বৃষ্টি বর্ষণ করুন, কিন্তু তারা আখেরাত সম্পর্কে কিছুই প্রার্থনা করত না। এ ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২০১) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জাহিলিয়া যুগে আরববাসীরা হজের কাজ সমাধান করে মিনায় একত্রিত হয়ে দোয়া করত, হে আল্লাহ! এ বছর আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশস্ততা দান করুন, আমাদের অভাব-অনটন দিবেন না বৃষ্টি বর্ষণ করুন ইত্যাদি বলে তারা কেবলমাত্র পার্থিব সুখ শান্তি কামনা করত। আখেরাতের জন্য কিছুই কামনা করত না। কেননা তাদের অনেকেই আখেরাতকে অস্বীকার করত এবং আখেরাতের সংগঠন সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারা দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আকিদা বিশ্বাসের মূলে কঠোরাঘাত করে বললেন, যদি তোমরা আখেরাত না চাও, কেবল দুনিয়া চাও, তাহলে আখেরাতে তোমাদের জন্য কিছুই থাকবে না।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** এ আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হজের সফর কালে কোনো ব্যক্তি যদি গমনাগমন পথে পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আরবের কাফেররা হজকে যে রকম ব্যবসার বাজার ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছিল কুরআন এ দু'টি বাক্যের দ্বারা তা সংশোধন করে দিয়েছে। এর একটি হলো– তোমরা যা কিছু উপার্জন করবে তা আল্লাহর অনুগ্রহ বিবেচনা করে সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। তাতে শুধু মুনাফা সংগ্রহই যেন উদ্দেশ্য না হয়। فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ বাক্যটিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ উপার্জনে তোমাদের কোনো পাপ হবে না।

আরাফার পরিচয় : শব্দগত দিক দিয়ে عَـرَفَـاتٌ শব্দটি বহুবচন। এটা একটি প্রসিদ্ধ প্রান্তরের নাম। এটা মক্কার হেরেমের বাইরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। হাজীদের জন্য ৯ই জিলহজ সে প্রান্তরে সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে পরবর্তী রাত্রের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় অবস্থান করা ফরজ। কেউ তা ছেড়ে দিলে হজই বাতিল হয়ে যাবে। কুরআনে আরাফাহকে বহুবচন عَـرَفَـاتٌ বলার পিছনে অনেক কারণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো– এ মাঠে নিজ প্রতিপালকের সুগভীর পরিচয় ও অনেক ইবাদত দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তা ছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানরাও এখানে পারস্পরিক পরিচয় লাভের সুযোগ পায়। তাই একে عَـرَفَـاتٌ বলা হয়।

قوله مَشْعَرِ الْحَرَامِ **-এর মর্মার্থ :** মিনা ও আরাফার ময়দানের মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে "মাশ্‌য়ারে হারাম" বলা হয়। আরাফাতে অবস্থানের পর মিনাতে ফিরার পথে ৯ই জিলহজ তারিখ দিবাগত রাতে এ স্থানে অবস্থান করতে হয়। মাশ্‌য়ারে হারাম নামক পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ রয়েছে। এখানে মাগরিব ও এশার নামাজ এক সঙ্গে পর পর আদায় করতে হয়। মিনায় শয়তানকে নিক্ষেপের জন্য এ স্থান হতেই সত্তরটি বা ততোধিক পাথর সংগ্রহ করে নিতে হয়।

اُذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ **-এর মর্মার্থ :** হে হাজীগণ! আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য তিনি যে নিয়ম বলে দিয়েছেন সে নিয়মেই তাঁকে স্মরণ কর। এতে স্বীয় মতামত ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়াস অনুযায়ী তো মাগরিবের নামাজ মাগরিবের সময় এবং এশার নামাজ এশার সময় পড়া উচিত। কিন্তু সে দিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা হলো– মাগরিবের নামাজ দেরি করে এশার নামাজের সময় পড়া হবে।

এ ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তা গ্রহণ করবে; বরং আল্লাহর জিকির ও ইবাদতের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মোতাবেক আদায় করলেই তা ইবাদত হবে। নিয়মের খেলাফ করা জায়েজ নয়, এতে কম বেশি করা অথবা, পূর্বাপর করা, যদিও এতে ইবাদত বেশি হয় তবুও তা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়।

আরাফার দিবসের ফজিলত : আরাফার দিবসের ফজিলত ইসলামে অত্যধিক, এর ছওয়াবও অনেক। এ দিনে আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নেককার লোকদের জন্য এ দিনে নেক কাজের কয়েকগুণ ছওয়াব নির্ধারিত হয়। নবী করীম ﷺ বলেন, আরাফার দিনের রোজা পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। –[কুরতুবী]

قوله ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ -এর মর্মার্থ : (অন্যান্য লোক যে স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে, তোমরাও সে স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর।) কা'বা ঘরের হেফাজতে নিয়োজিত আরবের কুরাইশগণ তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা রক্ষা কল্পে হজের ব্যাপারে কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নিয়েছিল। সকল মানুষ আরাফায় যেত এবং সেখানে অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করত, কিন্তু তারা রাস্তায় মুযদালিফা নামক স্থানে অবস্থান করত, আরাফাহ ময়দানে যেত না। বাস্তব পক্ষে এসব ছল-ছুতার উদ্দেশ্য ছিল অহঙ্কার ও অহমিকা প্রকাশ এবং সাধারণ মানুষ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। আল্লাহ তা'আলা তাদের অহমিকার সংশোধন কল্পে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরাও সেখানে (আরাফায়) যাও যেখানে অন্যান্য লোকজন যাচ্ছে। আর অন্যান্য লোকদের সাথেই তোমরা ফিরে এসো।

قوله فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ -এর বিশ্লেষণ : مَنَاسِكَ দ্বারা হজের অনুষ্ঠানাদিকে বুঝানো হয়েছে। মূলত مَنَاسِكَ অর্থ জবাই করা এবং কুরবানি করা। مَنَاسِكَ দ্বারা হজের নিয়ম-কানুনকে বুঝায়। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ কর।

قوله وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الخ বাক্যে مِنْ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য : এটা দ্বারা দু'ধরনের লোক উদ্দেশ্য। যথা–

(১) যারা আল্লাহর কাছে কেবল ইহকাল কামনা করে তারা সংখ্যায় খুব কম।

(২) যারা আল্লাহর কাছে ইহকাল-পরকাল উভয় কালের কল্যাণ কামনা করে তারা সংখ্যায় প্রচুর।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারীরা মোট চার প্রকার। যথা– (১) যারা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না, ওরা হলো কাফের। (২) যারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই প্রার্থনা করে, ওরা মু'মিন। (৩) যারা মুখে মু'মিনদের মতো বলে, অন্তরে তার বিপরীত বিশ্বাস করে, ওরা মুনাফিক। (৪) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চায় না, ওরাই সর্বাধিক সফলকাম।

قوله حَسَنَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : حَسَنَةً শব্দটি প্রকাশ্য বা গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক। দুনিয়ার কল্যাণ যেমন–শারীরিক সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুজির প্রাচুর্য, দু'নিয়ার যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল ও সচ্চরিত্র, উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আকিদার সংশোধন, সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা প্রভৃতিসহ অসংখ্য স্থায়ী নিয়ামত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ প্রভৃতি এরই অন্তর্ভুক্ত।

قوله لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا -এর ব্যাখ্যা : لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا এ উক্তিটির অর্থ দু'ভাবে গ্রহণ করা যায়। (১) পূর্বোল্লিখিত দু'টি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে তাদের কৃত আমল থেকে স্ব-স্ব প্রাপ্য হিস্যা দেওয়া হবে: প্রথম সম্প্রদায়কে শুধু পার্থিব জগতে, আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে উভয় জগতে। (২) ঐ দু'টি সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের কারণে যাথাযোগ্য প্রতিদান দেওয়া হবে।

قوله وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ -এর বিশ্লেষণ : অর্থাৎ আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। কেননা তার ব্যাপক জ্ঞান ও কুদরতের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি জগতের সমস্ত হিসাব গ্রহণের জন্য এমন কোনো উপকরণ ও জনবলের প্রয়োজন হবে না, যা মানুষের জন্য হয়ে থাকে। কাজেই তিনি সারা জগতবাসীর ও সৃষ্টিজগতের সকল হিসেব অতি অল্প সময়ে এবং মুহূর্তে গ্রহণ করবেন।

قوله أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ -এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা হজের আহকাম বর্ণনা প্রসঙ্গে একবার বলেছেন– أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ আবার বলেছেন– أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ সুতরাং أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ দ্বারা জিলহজের প্রথম দশ দিন, আর أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ দ্বারা আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন উদ্দেশ্য।

◈ **উক্ত দিনগুলোতে জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য :** জিকির দ্বারা আইয়্যামে তাশরীকে শয়তানকে পাথরকণা নিক্ষেপ করার সময় এবং প্রত্যেক নামাজের পরে যে তাকবীর দেওয়া হয় এখানে উক্ত তাকবীর উদ্দেশ্য, তবে নামাজের পরের তাকবীরের শুরু ও শেষ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। যেমন–(১) হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর (রা.) এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে কুরবানির দিনের জোহর থেকে শুরু করে আইয়্যামে তাশরীকের দিনের সকাল পর্যন্ত তাকবীর চলবে। এতে ১৫ ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর সাব্যস্ত হয়। (২) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, দশ তারিখ ফজর থেকে শুরু হবে এবং আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত চলবে। এতে আঠার ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। (৩) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অন্যান্যদের মতে নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে কুরবানির দিনের আসর পর্যন্ত, এতে আট ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। (৪) হযরত আলী, ইবনে মাসউদ (রা.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, আহমদসহ অন্যান্যদের মতে নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত তেইশ ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। চতুর্থ মতটির উপরই সাধারণ মানুষের আমল দেখা যায়। –[কাবীর]

◈ **মিনায় তড়িঘড়ি ও দেরির অর্থ :** যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনায় থাকতে চায়, অথবা তিনদিন অবস্থান করে, তাদের কারোই পাপ হবে না। একে অপরকে পাপী বলা ঠিক নয়। হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। তারা যে কোনো একটিতে আমল করতে পারেন। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত আমল করাই উত্তম। দুই দিন থেকে চলে আসাকে تَعْجِيْل এবং তিন দিন থাকাকে تَاخِيْر বলা হয়।

قوله وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ -এর পটভূমি : অর্থাৎ গুণতি কয়েক দিন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। এ কয়েক দিন বলতে তাশরীকের দিনসমূহ উদ্দেশ্য, যাতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীর বলা ওয়াজিব। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা মিনায় অবস্থান এবং জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা কতদিন আবশ্যক তা নিয়ে মতানৈক্য করত। কেউ কেউ মনে করত ১৩ই জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা এবং জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা জরুরি। আর যারা ১২ তারিখে তাড়াহুড়া করে কাজ সেরে সেখান থেকে ফিরে আসত তাদেরকে পাপী বলে ধারণা করত এবং এই কাজকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করত। আবার একদল ছিল যারা ১২ তারিখে প্রত্যাবর্তন করাকে জরুরি মনে করত এবং ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করাকে পাপ মনে করতো। এ আয়াত দু'টিতে তাদের মতানৈক্যের মীমাংসা প্রদান করা হয়েছে।

قوله فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ الخ -এর সংশ্লিষ্ট বিধান : অর্থাৎ যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনাতে অবস্থান করেই جَمْرَةٌ ثَالِثَةٌ -এর কাঁকর নিক্ষেপণের কাজ সম্পন্ন করত প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোনো পাপ নেই। আর যারা তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোনো পাপ নেই। পক্ষান্তরে এ দু'টি দল, যারা একে অপরকে পাপী বলে থাকে তারা উভয়েই ভুল পথে রয়েছে। প্রকৃত কথা হলো, হাজীরা উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। যে কোনো একটি আমল করতে পারে। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করাই উত্তম। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে, তার জন্য তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব নয়; কিন্তু মিনাতে থাকা কালে সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ পরদিন সকালেও করা যায়।

قوله وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ -এর মর্মার্থ : ইতঃপূর্বে হজের যত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে, এ বাক্যটি ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর অর্থ হলো, হজের সময় তোমরা যখন হজের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখনো প্রতিটি কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ রেখে আল্লাহকে ভয় কর এবং হজ করেছ বলে পরে অহংকার করো না। তখনো আল্লাহকে ভয় করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মানুষ হজ করে ফিরে আসে তখন সে তার পূর্বকৃত পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে। তাই এ উক্তিতে হাজীদেরকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেজগারী অবলম্বনের প্রতি বিশেষ তাগিদ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমরা পূর্বের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছ এখন পরের জন্য সর্তক হও। তাহলেই দুনিয়ার ও আখেরাতের মঙ্গল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা

পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণ ও সমভাবে কামনা করে, পরবর্তী আয়াতসমূহে নেফাক বা কপটতা ও 'ইখলাস' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফিক বা কপট আর কেউ মুখলিস বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

আয়াতের শেষাংশে, যাতে নিষ্ঠাবান মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাজিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রূমী (র.)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কুরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তুনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে কাছেও পৌছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পরবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কুরাইশদল রাজি হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রূমী নিরাপদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার ইরশাদ করলেন– رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى - رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى 'হে আবূ ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।' কোনো কোনো তাফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। –[মাযহারী]

পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশতঃ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরিয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদআতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদি আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের গোশত ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুহাম্মদী শরিয়ত তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে উটের গোশত ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর শরিয়তে তা ভক্ষণ করা ফরজ নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের গোশতকে হালাল জেনেও কার্যত তা বর্জন করি, তাহলে তো দু'কুলই রক্ষা পায়– হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের প্রতিও আস্থা রইল, অথচ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরিয়তেরও কোনো বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহর অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশি বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধন উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোনো বিষয়কে ধর্ম হিসেবে পালন করা না হবে, যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এমন সব বিষয়কে ধর্ম গণ্য করা হলো একটি শয়তানি প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসেবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اذْكُرُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

هَدَاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন।

كُنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা ছিলে।

الضَّآلِّيْنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مُضَاعَفْ ثلاثى অর্থ– যারা পথভ্রষ্ট, যারা বিভ্রান্ত, যারা গোমরাহ।

اَفِيْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف ـ ى ـ ض) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা প্রত্যাবর্তন কর।

قَضَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা সমাপ্ত করবে।

مَّنَاسِكَكُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে مَنْسَكٌ অর্থ– হজের কার্যাবলি।

يَّقُوْلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ– (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে বলেছে।

اٰتِنَا : এখানে نَا হলো যমীর, আর اٰتِ সীগাহ واحدمذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনসে মোরাক্কাব; ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– আমাদেরকে দাও।

تَعَجَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّعَجُّلُ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– সে তাড়াতাড়ি করল।

تَاَخَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّاَخُّرُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে বিলম্ব করল।

اتَّقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفرورق অর্থ– সে তাকওয়া অর্জন করেছে।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ : وَ টি হরফে আতফ, اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, سَرِيْعُ মুযাফ আর اَلْحِسَابُ হলো মুযাফ ইলাইহি অথঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হলো।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)

অনুবাদ (২০৪) আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে যে, আপনার নিকট তার আলাপ- আলোচনা যা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয়, চিত্তাকর্ষক মনে হয় এবং সে আল্লাহকে হাজির নাজির বর্ণনা করে নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি, অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥)

(২০৫) এবং যখন প্রস্থান করে, তখন এই চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় যে, দেশে অশান্তির সৃষ্টি করবে এবং শস্য ও জীবজন্তু বিনষ্ট করে দিবে, আর আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদ পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)

(২০৬) আর যখন কেউ তাকে বলে, আল্লাহকে তো ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাকে ঐ পাপের দিকে অগ্রসর করে দেয়, সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি- জাহান্নাম, আর এটা কী নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

(২০৭) আর কতক লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়, এবং আল্লাহ [এরূপ] বান্দাদের [অবস্থার] প্রতি খুবই করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৪) وَمِنَ النَّاسِ আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে مَنْ يُّعْجِبُكَ যে আপনার নিকট চিত্তাকর্ষক মনে হয় قَوْلُهٗ তার আলাপ- আলোচনা فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا যা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয় وَيُشْهِدُ اللّٰهَ এবং সে আল্লাহকে হাজির নাজির বর্ণনা করে عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।

(২০৫) وَاِذَا تَوَلّٰى এবং যখন প্রস্থান করে سَعٰى فِي الْاَرْضِ তখন এই চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় যে لِيُفْسِدَ فِيْهَا দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে وَيُهْلِكَ এবং বিনষ্ট করে দিবে الْحَرْثَ শস্য وَالنَّسْلَ ও জীবজন্তু وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না الْفَسَادَ ফ্যাসাদ।

(২০৬) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ আর যখন কেউ তাকে বলে اتَّقِ اللّٰهَ আল্লাহকে তো ভয় কর اَخَذَتْهُ তখন তাকে অগ্রসর করে দেয় الْعِزَّةُ অহঙ্কার بِالْاِثْمِ ঐ পাপের দিকে فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি-জাহান্নাম وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ আর এটা কী নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার।

(২০৭) وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এমনও আছে مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ যারা স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয় ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য وَاللّٰهُ এবং আল্লাহ رَءُوْفٌۢ খুবই করুণাময় بِالْعِبَادِ বান্দাদের [অবস্থার] প্রতি।

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٠٨)	অনুবাদ : (২০৮) হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বাস্তাবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٠٩)	(২০৯) অনন্তর তোমাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণাদি আসার পরেও যদি তোমরা [সীরাতের মুস্তাকীম হতে] পদস্খলিত হতে থাক, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা [প্রজ্ঞাময়]।
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٢١٠)	(২১০) তারা শুধু তারই প্রতীক্ষা করে যে, আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ যেন মেঘপুঞ্জের চাঁদোয়া তলে [শাস্তি দেওয়ার মানসে] তাদের নিকট আসেন এবং যাবতীয় বিষয়েরই মীমাংসা হয়ে যায়, আর এই সমস্ত [পুরস্কার ও শাস্তির] বিষয়াদি আল্লাহরই সমীপে উপস্থিত করা হবে।
سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢١١)	(২১১) আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাদেরকে কত উজ্জ্বল প্রমাণাদি দান করেছিলাম, পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতকে পরিবর্তন করে তার নিকট পৌঁছার পর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! ادْخُلُوْا তোমরা দাখিল হও فِى السِّلْمِ ইসলামে كَآفَّةً পূর্ণরূপে। وَلَا تَتَّبِعُوْا এবং অনুসরণ করে চলো না خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ শয়তানের পদাঙ্ক اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ বাস্তাবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(২০৯) فَاِنْ زَلَلْتُمْ অনন্তর যদি তোমরা [সীরাতের মুস্তাকীম হতে] পদস্খলিত হতে থাক مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ তোমাদের নিকট আসার পরেও الْبَيِّنٰتُ উজ্জ্বল প্রমাণাদি। فَاعْلَمُوْٓا তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী حَكِيْمٌ হিকমতওয়ালা [প্রজ্ঞাময়]।

(২১০) هَلْ يَنْظُرُوْنَ তারা শুধু তারই প্রতীক্ষা করে যে اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ যেন তাদের নিকট আসেন আল্লাহ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ মেঘপুঞ্জের চাঁদোয়া তলে وَالْمَلٰٓئِكَةُ এবং ফেরেশতাগণ وَقُضِىَ الْاَمْرُ এবং যাবতীয় বিষয়েরই মীমাংসা হয়ে যায় وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ আর এই সমস্ত [পুরস্কার ও শাস্তির] বিষয়াদি আল্লাহরই সমীপে উপস্থিত করা হবে।

(২১১) سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করুন كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ আমি তাদেরকে দান করেছিলাম, مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ কত উজ্জ্বল প্রমাণাদি وَمَنْ يُّبَدِّلْ পরন্তু যে ব্যক্তি পরিবর্তন করে نِعْمَةَ اللّٰهِ আল্লাহর নিয়ামতকে مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ তার নিকট পৌঁছার পর فَاِنَّ اللّٰهَ তবে নিশ্চয় আল্লাহ شَدِيْدُ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২০৪) قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : আখনাস বিন শারীক এর ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। সে একজন মুনাফিক ও মিষ্টভাষী ছিল। সে রাসূলের দরবারে এসে রাসূলের ভালোবাসার দাবি করত। আর এই ব্যাপারে সে আল্লাহকে সাক্ষী স্থাপন করত। এবং মিষ্ট কথার মাধ্যমে রাসূলকে আকৃষ্ট করে ফেলত। কিন্তু যখন সে মুসলমানদের শস্য ক্ষেত ও গবাদি পশুর পাশ দিয়ে যেত তখন তা জ্বালিয়ে ফেলত। তখন আল্লাহ তা'আলা তার এরূপ আচরণের কারণে হুজুর ﷺ-কে সতর্ক করার জন্য উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল – ২ : লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (র.) বর্ণনা করেন যে, একদা কতিপয় বেদুঈন রাসূল ﷺ-এর দরবারে আগমন করত একান্ত মার্জিত ছলনামূলক আরজ করল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদেরকে কুরআন ও অন্যান্য ইসলামি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকজন আলেম সাহাবী প্রেরণ করুন। রাসূল ﷺ তাদের কথা মতো একদল সুশিক্ষিত সাহাবী প্রেরণ করেন। সাহাবীররা যখন بَطْنُ الرَّجِيْعِ নামক স্থানে পৌছল, তখন বেদুঈন গোত্রের লোকেরা তাদের ঘেরাও করে হত্যা করে। তাদের উল্লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত নাজিল হয়।

(২০৭) قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللهِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : এই আয়াত হযরত সুহাইব রুমী (রা.) এর ব্যাপারে নাজিল হয়। হযরত সুহাইব রুমী (রা.) যখন মদিনার পানে রওয়ানা হন তখন মক্কার কাফেররা তার গতিরোধ করে আর তখন তিনি তুনির থেকে তীর বের করলেন। আর বললেন, তোমরা জান আমি একজন দক্ষ তীরন্দাজ। আমার তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমার হাতে একটা তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমার সাথে ঘেষতে পারবে না। যখন তীর শেষ হয়ে যাবে তখন তলোয়ার দিয়ে লড়াই করব। যখন তলোয়ার ভেঙ্গে যাবে তখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। তবে তোমাদের আমি একটি উত্তম প্রস্তাব দিচ্ছি আমি মক্কায় সহায় সম্পত্তি সব রেখে এসেছি তোমরা সেগুলো নিয়ে যাও। এবং বিনিময়ে আমার পথ ছেড়ে দাও। তখন কাফেররা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার পথ ছেড়ে দিল। তিনি মদিনায় পৌছে পূর্ণ ঘটনা বললে হুজুর ﷺ বললেন,– رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى তখনই এই আয়াত নাজিল হয়।

(২০৮) قوله يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَاۗفَّةً الخ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে নাজিল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, ইহুদি ধর্মে শনিবার দিনটিকে সম্মান করা ওয়াজিব ছিল এবং উটের গোশত খাওয়া হারাম ছিল। তাই তাদের ধারণা হলো ইহুদি ধর্মে শনিবার দিনকে সম্মান করা ওয়াজিব। ইসলাম ধর্মে তাকে অসম্মান করা ওয়াজিব নয়; তদ্রূপ ইহুদি ধর্মে উটের গোশত খাওয়া হারাম কিন্তু ইসলাম ধর্মে উটের গোশত খাওয়া বাধ্য করা হয়নি। অর্থাৎ, হালাল। অতএব আমরা যদি শনিবার কে সম্মান করি এবং উটের গোশতা হালাল জানা সত্ত্বেও যদি এটা বর্জন করি তাহলে হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মের প্রতি আস্থা রইল এবং ইসলাম ধর্মের বিরোধিতাও হলো না। ফলে আমাদের উভয় কুলই রক্ষা পাব। তাছাড়া এর দ্বারা ধর্মের প্রাতি আস্থা, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী অতি মাত্রা প্রকাশ পাবে। তাই তারা রাসূলের দরবারে একথাটি প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন।

قوله وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ -এর মর্মার্থ : শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর, কুটিল ষড়যন্ত্রকারীকে اَلَدُّ الْخِصَامِ বলা হয়। যে শত্রু তার শত্রুতায় বুদ্ধি, অর্থ, হাতিয়ার ইত্যাদি সর্বপ্রকার মাধ্যম ব্যবহার করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, চুক্তি ভঙ্গ, কুটিল অপকৌশলের কোনো দিক ব্যবহারের বাকি রাখে না, তাকেই اَلَدُّ الْخِصَامِ বলে অভিহিত করা হয়। এরকম শত্রুরা নিজেদের কার্য সিদ্ধির যে কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

حَرْثٌ শব্দের অর্থ : ফতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, حَرْثٌ শব্দের অর্থ বিদীর্ণ করা, ছিদ্র করা। এ কারণেই লাঙ্গলকে حَرْثٌ বলা হয়। যেহেতু তা দ্বারা জমি বিদীর্ণ করা হয়। حَرْثٌ শব্দটি এখানে এবং সূরা আলে ইমরানে ফসলাদি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ফসলের বীজ মাটি বিদীর্ণ করে বুনতে হয় এবং তা মাটি বিদীর্ণ করে উদগত হয়, তাই উহাকে حَرْثٌ বলে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা রূপক অর্থে মেয়েদেরকে حَرْثٌ বলেছেন। কেননা তারা সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র স্বরূপ।

قَوْلُهُ اَلنَّسْلَ -এর অর্থ : ফতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, نَسْل -এর শাব্দিক অর্থ- বিচ্ছিন্ন হওয়া, পড়ে যাওয়া, ঝরে পড়া। আর সন্তানদের نَسْل বলা হয় এজন্য যে, যেহেতু ওরা মায়ের পেট থেকে ঝরে পড়ে। আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, نَسْل শব্দটি একবচন, বহুবচন اَنْسَالٌ আসে। অর্থ হলো-সন্তান, বংশধর।

قوله ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً الخ : سِلْم শব্দটি যের ও যবর সহযোগে [সিলম ও সালম] দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি', অপরটি 'ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। -[ইবনে কাসীর] كَافَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে' এবং 'সাধারণভাবে' এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে। اُدْخُلُوْا [তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও] শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে سِلْم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে, তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত, পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজীনিতর সাথে হোক, অথবা এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে, - ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানবজীবনের যে কোনো বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দিবে, সে পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতের যে শানে নুযূল উপরে বলা হয়েছে। মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দিবে।

সতর্কতা : যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দীনদারদের মধ্যেই এ ত্রুটি বেশিরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতি নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোনো আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ! অন্ততঃপক্ষে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) রচিত 'আদাবে মো'আশারাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুর্যুগানে দীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সমস্ত গুণাবলি ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّدَدُ মূলবর্ণ (ل . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى একবচন, বহুবচন اَلْدَادٌ অর্থ- ভীষণ ঝগড়াটে, তীব্র ঝগড়াকারী।

اَلْخِصَامِ : বাব مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার। অর্থ- ঝগড়া করা।

اَخَذَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনসে مهموز فاء অর্থ- সে ধরেছে।

اَلْمِهَادُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন أَمْهِدَةٌ ও مُهُدٌ অর্থ– বিছানা, ঠিকানা।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে।

كَافَّةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন كَافَّاتٌ অর্থ– প্রতিহত করা, দূর করা।

زَلَلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّلَلُ . اَلزُّلُوْلُ . اَلزَّلُّ মূলবর্ণ (ز . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমাদের পদস্খলন ঘটে।

قُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضْىُ মূলবর্ণ– (ق . ض . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মীমাংসা হবে।

تُرْجَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر . ج . ع) জিনস صحيح অর্থ– এটা প্রত্যাবর্তিত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ : এখানে واو বর্ণটি حرف عطف আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা رَءُوْفٌ শিবহে ফে'ল আর بِالْعِبَادِ-এর باء হরফে জার, اَلْعِبَادْ মাজরূর মিলে متعلق; অতঃপর শিবহে ফে'ল তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر; এখন مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, এতে اَنْتُمْ উহ্য সর্বনামটি যুলহাল, كَآفَّةً হাল, যুলহাল ও হালা মিলে فاعل আর فِى السِّلْمِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق সর্বশেষে فعل ও فاعل এবং متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ : এখানে لَا تَتَّبِعُوْا ফে'ল, এতে اَنْتُمْ উহ্য সর্বনামটি ফা'য়েল খُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول به এখন فعل ও فاعل এবং مفعول به মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ : এখানে اِنَّ টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ৷ ه টি اِنَّ-এর اسم, তারপর لَكُمْ জার ও মাজরূর মিলে متعلق অতঃপর মাওসূফ ও সিফাত মিলে اِنَّ এর خبر সর্বশেষে عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ এবং اسم ও خبر তার اِنَّ মিলে جملة اسمية হলো।

قوله وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ : এখানে واو টি حرف عطف এবং اِلَى اللّٰهِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق مقدم আর تَرْجِعُ ফে'লে মাজহুল الْاُمُوْرُ নায়েবে ফা'য়েল, অবশেষে ফে'লে মাজহুল, তার নায়েবে ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ : এখানে سَلْ ফে'ল, এতে اَنْتَ উহ্য সর্বনাম ফা'য়েল, আর بَنِىْ মুযাফ اِسْرَائِيْلَ মুযাফ ইলাইহি। অতএব, মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে مفعول به হলো। অতঃপর فعل . فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : এখানে فَاءٌ টি فاء جزائية আর اِنَّ হরফটি حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهُ শব্দটি اِنَّ-এর اسم ও شَدِيْدُ الْعِقَابِ উভয়টি مضاف اليه ও مضاف মিলে اِنَّ-এর خبر অবশেষে اِنَّ তার اسم এবং خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ (২১২) পার্থিব জীবন কাফেরদের নিকট সুসজ্জিত মনে হয় এবং [এ কারণেই] তারা এই সমস্ত মুমিনদের সাথে বিদ্রূপ করে। অথচ [মুসলমানগণ] যারা [কুফর ও শিরক হতে] বেঁচে থাকে, ঐ সমস্ত কাফের হতে উচ্চস্তরে থাকবে কিয়ামতের দিন, আর রিজিক তো আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাবে দিয়ে থাকেন।	زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)
(২১৩) সকল মানুষ [এক কালে] একই পথের ছিল। অনন্তর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন, যাঁরা সুসংবাদ প্রদান করতেন ও ভীতি প্রদর্শন করতেন, আর তাঁদের সাথে কিতাবও যথাযথভাবে নাজিল করলেন, এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দিবেন, এবং এই কিতাবে মতভেদ আর কেউ করেনি, কেবল তারাই, যারা এই কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসহ আসার পর তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুন, অতঃপর আল্লাহ [সর্বদা] মুমিনদেরকে ঐ সত্য যা নিয়ে [মতবিরোধকারীরা] মতবিরোধ করত, স্বীয় করুণায় বলে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।	كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢١٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(২১২) زُيِّنَ সুসজ্জিত মনে হয় لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের নিকট الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন وَيَسْخَرُوْنَ এবং তারা বিদ্রূপ করে مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই সমস্ত মুমিনদের সাথে وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا অথচ যারা বেঁচে থাকে فَوْقَهُمْ ঐ সমস্ত কাফের হতে উচ্চস্তরে থাকবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন وَاللّٰهُ يَرْزُقُ আর রিজিক তো আল্লাহ দিয়ে থাকেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে চান بِغَيْرِ حِسَابٍ বে-হিসাবে।

(২১৩) كَانَ النَّاسُ সকল মানুষ ছিল اُمَّةً وَّاحِدَةً একই পথের فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ অনন্তর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন مُبَشِّرِيْنَ যাঁরা সুসংবাদ প্রদান করতেন وَمُنْذِرِيْنَ ও ভীতি প্রদর্শন করতেন وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ আর তাঁদের সাথে কিতাবও নাজিল করলেন بِالْحَقِّ যথাযথভাবে لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়সমূহের وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ এবং এই কিতাবে মতভেদ আর কেউ করেনি اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ কেবল তারাই, যারা এই কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসহ আসার পর بَغْيًا بَيْنَهُمْ তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুন فَهَدَى اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ বলে দেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদেরকে لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ যা নিয়ে মতবিরোধ করত مِنَ الْحَقِّ ঐ সত্য بِاِذْنِهٖ স্বীয় করুণায় وَاللّٰهُ يَهْدِيْ আর আল্লাহ তা'আলা প্রদর্শন করেন তাকে مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা করেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সঠিক পথ।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ (٢١٤)

অনুবাদ : (২১৪) অপর একটি কথা শ্রবণ কর, তোমরা কি মনে কর যে, [বিনা শ্রমে] বেহেশতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো তাদের ন্যায় তোমাদের সম্মুখে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে, তাদের উপর [বিরোধীদের কারণে] এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও তাঁর মুমিন সাথীগণও বলে উঠেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? স্মরণ রেখ! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (٢١٥)

(২১৫) লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কোন জিনিস [এবং কোথায়] ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন যে, যা কিছু তোমরা ব্যয় করতে চাও তা পিতা মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের ও পিতৃহীন শিশুদের ও অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য। আর যে কোনো নেক কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তৎসম্বন্ধে খুবই অবহিত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৪) اَمْ حَسِبْتُمْ তোমরা কি মনে কর اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ যে বেহেশতে প্রবেশ করবে وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ অথচ এখনো তাদের ন্যায় তোমাদের সম্মুখে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেনি الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে مَسَّتْهُمُ তাদের উপর [বিরোধীদের কারণে] এমন এমন الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল وَزُلْزِلُوْا এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ স্বয়ং রাসূল বলে উঠেছিলেন وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ও তাঁর মুমিন সাথীগণও مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? اَلَآ স্মরণ রেখ! اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

(২১৫) يَسْـَٔلُوْنَكَ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে مَاذَا يُنْفِقُوْنَ তারা কোন জিনিস [এবং কোথায়] ব্যয় করবে قُلْ আপনি বলে দিন যে مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ যা কিছু তোমরা ব্যয় করতে চাও فَلِلْوَالِدَيْنِ তা প্রাপ্য পিতা মাতার وَالْاَقْرَبِيْنَ ও আত্মীয়-স্বজনের وَالْيَتٰمٰى ও পিতৃহীন শিশুদের وَالْمَسٰكِيْنِ ও অভাবগ্রস্তদের وَابْنِ السَّبِيْلِ ও মুসাফিরদের وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ আর যে কোনো নেক কাজ করবে فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ আল্লাহ তা'আলা তৎসম্বন্ধে খুবই অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১২) قوله زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম সুয়ূতী তাঁর لُبَابُ النُّقُوْلِ فِىْ اَسْبَابِ النُّزُوْلِ গ্রন্থে বলেন, আরবের মুশরিকরা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র সাহাবীদের দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। যেমন– হযরত আবূ উবায়দা, আমের, সালেম, খাব্বাব, আম্মার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্যদেরকে তারা বলতো, মুহাম্মদ কি শুধু গরিবরা তাঁকে অনুসরণ করবে তাতেই খুশি? যদি মুহাম্মদ -এর ধর্ম সত্য হতো তাহলে ধনী লোকেরাও তাঁর অনুসারী হতো। এসব গরিব লোকের অনুসরণে তাঁর কি কাজ? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব উক্তির জবাবে এ আয়াতটি নাজিল করেন।

(২১৪) قوله اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কোনো কোনো মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, খন্দকের মুজাহিদদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। কেউ কেউ বলেন, ওহুদের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাজিল হয়।

(২১৫) قوله يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আমর বিন জামূহ (রা.) অনেক সম্পদশালী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহঙ্কার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্রের জন্য উপহাস করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে। –[যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী]

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনো এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'আলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তাবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত। এ আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে– كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কুরআনে' বলেছেন, আরবি অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোনো বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাস জনিতই হোক অথবা একই যুগ একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোনো অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক।

'কোনো এক কালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' এতে দু'টি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ একতা বলতে কোন ধরনের একতাকে বুঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ এই একতা কখন ছিল? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রাসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নবী ও রাসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানি কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না; বরং মতাবদর্শ, আকাইদ ও ধ্যান–ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বুঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান। ১. হয় তখনকার সব মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের প্রতি বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল নতুবা ২. সবাই মিথ্যা ও কুফরিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তাফসীরকারের সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকিদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা ভিত্তিক। অর্থাৎ,তাওহীদ ও ঈমানের ঐকমত্য।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 'এক' বলতে আকিদা ও তরিকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম বলে আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? তাফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে যায়েদ (রা.) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার জগতের ব্যাপারে। অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?] তখন একবাক্যে সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এই একত্বের বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আ.) স্বস্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করল। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আ.)-এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরিয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল ছাড়া সবাই তাওহীদের সমর্থক ছিলেন।

'মুসনাদে বায্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদরীস (আ.) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হলো দশ 'করন'। বাহ্যতঃ এক 'করন' দ্বারা এক শতাব্দী বুঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান পর্যন্ত। হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান, সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তবপক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের উপর কায়েম ছিল। পরবর্তী আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কোনো কারণ বর্ণনা না করেই বলা হয়েছে– 'আমি নবী-রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।'

এ দুটি বাক্য আপাতত দৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোনো মত পার্থক্য ছিল বলেই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। যারা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্য এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কুরআন কখনো অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী কিংবা ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে উল্লিখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি; বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বুঝা যায়। ফলে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্বাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কি ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্বীয় আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন, আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, নবী-রাসূল এবং আসমানি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলিলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ, ইহুদি ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানি কিতাবে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বুঝা যায় না বা বুঝতে ভুল হয়; বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝেও শুধুমাত্র গোড়ামী ও জিদবশতঃ তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহর দেওয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করেছে এবং নবী রাসূল ও আসমানি কিতাবসমূহের মীমাংসা সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের উপর পুনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ জিদবশতঃ অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য নবী রাসূল ও আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল, 'মিল্লাতে ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো না কোনো নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাজিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আরো কজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী-রাসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কুরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যই তাঁর পরে নবুয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খতমে-নবুয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : বুঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথা ও পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগিলক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না; বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরশাদ হয়েরেছ– كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে। এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেওয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্ব করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধাচারণকারীদের সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করতে থাকা।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে; এতে কোনো কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্ন স্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ

"সবচাইতে অধিক বালা-মসিবতে পতিত হয়েছেন, নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।"

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে' তা কোনো সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে ; বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহর প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুতঃ নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরি ও মুনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কুরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল কুরবান করার ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জান-মাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষাঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন– যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রাসূল কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেগুলোর উত্তর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। সে মতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কুরআন শরীফে রয়েছে– قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ –এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলা ফতোয়া দেওয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোনো প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রাসূল ﷺ দিয়েছেন, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রুকূ'তে শরিয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কুরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি

জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা বাকারায়, একটি সূরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা'হা ও সূরা নাযি'আতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল। যার উত্তর কুরআনে কারীমে উত্তরের আকারেই দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণের চাইতে কোনো উত্তম দল আমি দেখিনি; ধর্মের প্রতি তাঁদের এহেন ভালোবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কুরআনে কারীমে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রশ্ন করতেন না। –[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ, মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই দুটি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লিখিত আয়াতে দেওয়া হয়েছে, দু' আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বুঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দুটি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে এই যে, হযরত আমর ইবনে নূহ রাসূল ﷺ- কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে مَا نُنْفِقُ مِنْ اَمْوَالِنَا وَاَيْنَ نَضَعُهَا অর্থাৎ, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে এ প্রশ্নটির দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা?

দু আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে নুযূল ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাই, কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহর পথে ব্যয় করব? এখানে এ প্রশ্নের একটিমাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ কি ব্যয় করা হবে এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নের কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করব? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কুরআন মাজীদ যা বলেছে, তাতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব' এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কুরআন মাজীদে বর্ণিত দুটি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ, কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে– আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরগণ।' আর দ্বিতীয় অংশের জবাবে অর্থাৎ, কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ তা'আলা জানেন।' বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয় তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করব তা কাকে দেব? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করব? এর উত্তরে বলা হয়েছে قُلِ الْعَفْوَ 'আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।' এতে বুঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানদেরকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোনো বিধান নেই। এতে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহর পছন্দ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সুশোভিত করা হয়েছে। সাজানো হয়েছে।

يَسْخَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّخْرُ মূলবর্ণ (س ـ خ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। উপহাস করেছে।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– সে চায়।

مُبَشِّرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– সুসংবাদাতাগণ।

وَمُنْذِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সতর্ককারীগণ।

لِيَحْكُمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح ـ ك ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তিনি মীমাংসা করবেন।

اخْتَلَفُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِلَافُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিরোধিতা করল।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে হেদায়েত করে, পথ প্রদর্শন করে।

زُلْزِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلزَّلْزَلَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ل ـ ز ـ ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– তাদেরকে কাঁপিয়ে দেওয়া হলো। প্রকম্পিত করা হলো।

يَسْئَلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س ـ أ ـ ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে।

يُنْفِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা ব্যয় করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : এখানে زُيِّنَ হলো فعل مجهول আর ل হরফটি حرف جار এবং اَلَّذِيْنَ হলো اسم موصول আর كَفَرُوْا হলো فعل এবং এতে هُمْ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো। اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا উভয়টি موصوف ও صفت মিলে نائب فاعل হলো زُيِّنَ ফে'লে মাজহুল-এর। فعل مجهول তার متعلق ও نائب فاعل মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ : এখানে و টি حرف عطف আর اَللّٰهُ মুবতাদা يَرْزُقُ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল আর مَنْ অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল, يَشَآءُ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল, باء টি حرف جار আর غَيْرِ মোযাফ ও حِسَابٍ মোযাফ ইলাইহি মিলে مجرور; জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে يَرْزُقُ ফে'লের সঙ্গে; ফে'ল, ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার موصول ও صلة মিলে مفعول به হলো يَرْزُقُ ফে'লের। এখন فعل ـ فاعل ও مفعول به এবং متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٢١٦)

অনুবাদ : (২১৬) জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরজ, অথচ তা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, আর এ কথা সম্ভব যে, তোমরা কোনো বিষয়কে অপ্রীতিকর মনে কর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর এটাও সম্ভব যে, কোনো বিষয় তোমরা প্রীতিকর মনে কর অথচ তা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর, এবং আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢١٧)

(২১৭) মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি বলে দিন, তাতে [ইচ্ছাকৃতভাবে] যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ, আর আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর সাথে ও মসজিদে হারামের সাথে কুফরি করা, এবং মসজিদে হারামের অধিকারীদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করা তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ আল্লাহর নিকট, আর অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য, আর এই কাফেররা তোমাদের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ বাধিয়েই রাখবে এই উদ্দেশ্যে যে, সুযোগ পেলেই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরিয়ে দিবে, আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, অনন্তর কাফের অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, তবে এরূপ লোকের আমলসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ হয়ে যায়, এবং এরূপ লোক দোজখী হয়, তারা দোজখে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৬) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরজ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا আর এ কথা সম্ভব যে, তোমরা কোনো বিষয়কে অপ্রীতিকর মনে কর وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا আর এটাও সম্ভব যে, কোনো বিষয় তোমরা প্রীতিকর মনে কর وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর وَاللّٰهُ يَعْلَمُ এবং আল্লাহ জানেন وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আর তোমরা জান না।

(২১৭) يَسْـَٔلُوْنَكَ মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ সম্মানিত মাসে قِتَالٍ فِيْهِ যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্বন্ধে, قُلْ আপনি বলে দিন قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করা وَكُفْرٌۢ بِهٖ এবং আল্লাহর সাথে কুফরি করা وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ও মসজিদে হারামের সাথে وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ এবং মসজিদে হারামের অধিকারীদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করা اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ আল্লাহর নিকট وَالْفِتْنَةُ আর অশান্তি সৃষ্টি করা اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ হত্যা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ আর এই কাফেররা তোমাদের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ বাধিয়েই রাখবে حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরেয়ে দিবে। اِنِ اسْتَطَاعُوْا সুযোগ পেলেই وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ফিরে যায় عَنْ دِيْنِهٖ স্বীয় ধর্ম হতে فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ অনন্তর কাফের অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয় فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ তবে এরূপ লোকের আমলসমূহ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ হয়ে যায় وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এবং এরূপ লোক দোজখী হয় هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা দোজখে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢١٨)

অনুবাদ : (২১৮) প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে, এমন লোকই আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করে, আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, করুণা করবেন।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ (٢١٩)

(২১৯) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের [ব্যবহারের] মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের [কোনো কোনো] উপকারও আছে, আর এতদুভয়ের [উক্ত] পাপরাশি তাদের উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর, আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কি পরিমাণ ব্যয় করবে, আপনি বলে দিন যে পরিমাণ সহজ হয়, আল্লাহ এভাবে বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন, যেন তোমরা চিন্তা করে নাও।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৮) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا এবং যারা হিজরত করেছে وَجَاهَدُوْا এবং জিহাদ করেছে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ এমন লোকই আশা পোষণ করে رَحْمَتَ اللّٰهِ আল্লাহর রহমতের وَاللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করবেন رَحِيْمٌ করুণা করবেন।

(২১৯) يَسْـَٔلُوْنَكَ মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ মদ ও জুয়া সম্বন্ধে قُلْ আপনি বলে দিন فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ এতদুভয়ের [ব্যবহারের] মধ্যে গুরুতর পাপও আছে وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ এবং মানুষের উপকারও আছে وَاِثْمُهُمَآ আর এতদুভয়ের পাপরাশি اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا তাদের উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর وَيَسْـَٔلُوْنَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে مَاذَا يُنْفِقُوْنَ কি পরিমাণ ব্যয় করবে قُلِ আপনি বলে দিন الْعَفْوَ যে পরিমাণ সহজ হয় كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ আল্লাহ এভাবে সু-স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন لَكُمُ الْاٰيٰتِ বিধানসমূহ তোমাদের জন্য لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ যেন তোমরা চিন্তা করে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১৭) قوله يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবিলায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা পথে ইবনে হাদরামী নামক এক কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের জানা ছিল না সে দিন জুমাদাস সানিয়ার ৩০ তারিখ ছিল না কি রজবের প্রথম তারিখ ছি। তারিখের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। ওদিকে মুশরিকরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অভিযোগ তুলল যে, তারা সম্মানিত মাস রজবের প্রতি সম্মান দেখায় না। রজব মাসেই তারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[বায়জাবী– ১ : ১৪৭, মুখতাসার ইবনে কাসীর– ১ : ১৯০, রুহুল মা'আনী– ২ : ১০৭]

(২১৮) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ও তার সাথীরা উল্লিখিত ঘটনার কারণে বলতে লাগল সম্মানিত মাসে লড়াইয়ের কারণে যদিও আমাদের কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু আমরা ছওয়াবের অধিকারী হব না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[বায়জাবী– ১ : ১৪৮]

(২১৯) قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত যুগের সাধারণ রীতি নীতির মতো মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-এর হিজরতের পরেও মদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক বুদ্ধিকে অভ্যাসের উপর স্থান দেন, যদি কোনো অভ্যাস বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থি হয় তবে সে অভ্যাসের ধারে কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা যে সব বস্তু কোনো কালে হারাম হবে এমন সব বস্তুর প্রতিও তার অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা হালাল থাকা কালেও মদ্যপান তো দূরের কথা তা স্পর্শও করেনি। মদিনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আজম, হযরত মা'আজ বিন জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন সম্পদও ধ্বংস করে দেয় এ সম্পর্কে আপানার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মধ্যে অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয় যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বুঝানো হয়েছে যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এতে মানুষের সব চাইতে বড় গুণ বুদ্ধি বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন কঠিন গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। আয়াতটি মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর কোনো কোনো সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন এ আয়াতে মদকে হারাম করা হয়নি এবং এটা দীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। যাতে ফেতনায় পড়তে না হয় সে জন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(২১৯) قوله وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং সা'লাবা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তার রাহে খরচ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আর আমাদের কাছে গোলামও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পদ রয়েছে এর মধ্য থেকে আমরা কি কি দান করব? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১৮]

জিহাদের কয়েকটি বিধান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জিহাদ ফরজ হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলোর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো।' এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরজ। তবে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও রাসূল ﷺ-এর হাদীসের বর্ণনাতে ঝুঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরজ, ফরজে আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না; বরং এটা ফরজে কেফায়া। যদি মুসলমানদের কোনো দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোনো দেশে বা কোনো যুগে কোনো দলই জিহাদের ফরজ আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরজ থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হতে হবে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ-এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কুরআনের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা জান এবং মালের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।'

এতে যেসব ব্যক্তি কোনো অসুবিধার জন্য বা অন্য কোনো ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরজে আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না।'

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ 'কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে গেল না' এ আয়াতে কুরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদের ফরজ আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীম দানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন জিহাদ ফরজে আইন না হয়ে ফরজে-কেফায়া হবে।

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বলল, জি! বেঁচে আছেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতামাতার খেদমত করেই জিহাদের ছওয়াব হাসিল কর। এতেও বুঝা যায় যে, জিহাদ ফরজে কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটি দল জিহাদের ফরজ আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমানগণ অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরজে আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীমের সূরা তওবায় ইরশাদ হয়েছে– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ

অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।"

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, যদি কোনো ইসলামি দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরজ আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরজ পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরজে আইন হয়ে যায়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরজে কেফায়া।

যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরজে কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরজে কেফায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরজে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে ইরশাদ হয়েছে যে, 'যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোনো কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোনো বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল; কিন্তু পরিণামে দেখা গেল তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে : 'জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বুঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি করছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।"

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশাবলি : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ, রজব, জিলকদ, জিলহজ এবং মহররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কুরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা– مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে হুজুর ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লিখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য।

ইমামে তাফসীর, আতা ইবনে আবী রাবাহ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোনো মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً আয়াতটি উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াতটি হচ্ছে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ حَيْثُ শব্দটি এ স্থলে কাল বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই [মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত] পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রাসূল ﷺ-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত 'আমের আশআরীকে' আওতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন।

রূহুল মা'আনী এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরা বারা'আতের প্রথম রুকূ'র তাফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'ইজমায়ে উম্মতের' কথা উল্লেখ করেছেন। –[বয়ানুল কুরআন]

কিন্তু তাফসীরে মাযহারী এসব দলিলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয়, আয়াতুস সাইফ'। অর্থাৎ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ পরন্তু এ আয়াতটি জিহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর ﷺ-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর তায়েফ অবরোধ জিলকদ মাসে নয়; বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লিখিত আয়াতকে মানসূখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফেররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের জন্যও বৈধ হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকু রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যও জায়েজ। যেমন, ইমাম জাস্সাস হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম : উল্লিখিত আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে– حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, "তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের জন্য বরবাদ হয়ে গেছে।" এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তি উত্তরাধিকার বা মিরাশের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামাজ-রোজা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের ছওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাসআলা : যদি এমন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে পরকালে দোজখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরিয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরজ হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামাজ রোজার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) দ্বিতীয়বার হজকে ফরজ বলেন এবং পূর্বের নামাজ রোজার ছওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফের হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোনো কাজ করে থাকে, কোনো দিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের ছওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

মাসআলা : মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফেরদের থেকে জিজিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেনান মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

সাহাবীগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দুটির তাৎপর্য ও বিধানগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান : ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মতো মদ্যপান ও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-এর হিজরতের পরেও মদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোনো অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থি হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে কাছে ও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর স্থান সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা যেসব বস্তু কোনো কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তাঁর অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকাকালেও মদ্য পান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি।

মদিনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আজম, হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন : "মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?" এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দুটির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়, যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বুঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি; বরং এটা দীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাজিল হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ : একদিন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) সাহাবীগণের মধ্য হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাজের সময় হলে সবাই নামাজে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত রাখার জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। ইরশাদ হলো– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেয়ো না।' এতে নামাজের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামাজ থেকে বিরত রাখে,

তাতে কোনো কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামাজ থেকে বিরত করে। যেহেতু নামাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতঃমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহঙ্কারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে হযরত সা'দ (রা.) রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুজুর ﷺ দোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।" তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানি কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ

আল্লাহর নির্দেশাবলির তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরিয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ইসলামি শরিয়ত কোনো বিষয়ে কোনো হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।' এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামি শরিয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদপান সম্পর্কে এ চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে; মদ্যপান হারাম করা হয়নি; বরং এ আয়তটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোনো নির্দেশ এতে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসায় বলা হয়েছে– لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى এতে বিশেষভাবে নামাজের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে রয়েছে সূরা মায়েদায়। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শরিয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো।

আলেমগণ বলেছেন, 'যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোনো অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চাইতেও কষ্টকর।' এ জন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাজের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সব শেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমতঃ ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এজন্য রাসূল ﷺ শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– "সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতম পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'শরাব এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না'। তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা.) হুজুর ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর ﷺ মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণির ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) পানকারী (৪) যে পান করায় (৫) আমদানিকারক (৬) যার জন্য আমদানি করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি; বরং যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোনো প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ : আদেশ পাওয়া মাত্র অনুগত সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদিনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রা.) তখন এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। হযরত আবূ তালহা, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রা.) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন– এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে– হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদিনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মতো শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদিনার অলি-গলির অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।

যখন আদেশ হলো যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্রিত কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবীগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্রিত করেছিলেন।

হুজুর ﷺ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবীগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানি করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদিনায় প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছল, তখন সে সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুজুরে আকরাম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী ﷺ হুকুম করলেন– মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জিযা এবং সাহাবীগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণ হলো। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীম ﷺ একটিমাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তারা শরাবের প্রতি তেমনি ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যেমন পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামি রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনাসমূহে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মু'জিযা বা নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা

ইসলামি রাজনীতির অপরিহার্য ফলশ্রুতিও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরব দেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশি ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘণ্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরশপাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমুল পরিবর্তন সাধিত হলো। সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য পরিগণিত হয়ে গেল।

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নতমানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজসংস্কারকগণ মদ্যপানের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলোর অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্য জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে অভিহিত প্রচারের আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমেই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হলো, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচারও বিতরণ করা হলো। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাশ করা হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারি প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে। তা হলো এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বিরাট পার্থক্যের কারণ ও রহস্য কি?

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, ইসলামি শরিয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি; বরং আইনের পূর্বে তাদের মন মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রাসূল ﷺ-এর একটিমাত্র আহ্বানেই তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছুর বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরির কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরি হয়ে গেল। তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সবকিছু ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা : এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কুরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান– কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশি। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা এবং অপকারিতাগুলো কি কি? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশি হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফিকহের কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক : এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে শরাব-পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোনো বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন, যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধার মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হাল্কা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মতো বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষ্মা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি।

ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোনো কোনো ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোনো কাজ ই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীগণের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনো শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফূর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচেয়ে গুরুতর। সুতরাং কুরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলেছে– إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ অর্থাৎ 'শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।'

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোনো গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেরই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়, যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা তার কাজ ও চালচলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরো একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এ জন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, জেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া চলে না। অন্য কোনো ইবাদত অথবা আল্লাহর কোনো জিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্য কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– 'শরাব তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখে।'

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোনো এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রাসূল ﷺ একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন– أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأُمُّ الْخَبَائِثِ অর্থাৎ 'শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।' এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতোই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।
–[তাফসীরে আল মানার : মুফতি আবদুহু : ২ : ২২৬]

আল্লামা তানতাবী (র.) আল জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে– ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম' এ লিখেছেন– 'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দুধারী তলোয়ার ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আর যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।'

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লিখেন, 'ইসলামি শরিয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার।

সারকথা, যে কোনো সৎ লোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, 'এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানি কাজ, এ যে ধ্বংসের উপকরণ। এই 'উম্মুল খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে কাছেও যেয়ো না; ফিরে এসো فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কুরআনের চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহলের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়। যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যাদি সম্পর্কে কুরআনি বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই– وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ
অর্থাৎ, 'আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।'

তাফসীর ও ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ তা'আলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসেবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোনো কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ কিছু খাদ্য বস্তু তৈরি করে থাকে, যাতে তাদের উপকার হয়, এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দু' রকমের খাদ্য তৈরি হয়েছে। একটি হলো নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। অর্থাৎ, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরির কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে? নেশাজাত দ্রব্য তৈরি করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তাফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলিল দেওয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর নিয়ামত। যথা, সমস্ত আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েজ পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহর নিয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, 'কোন পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ তা'আলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীতে 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, নেশা ভালো বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসির নেশাযুক্ত বস্তুকেও 'সুকর' (سَكَرٌ) বলেছেন। –[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস]

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভালো নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। –[জাসসাস ও কুরতুবী]

জুয়ার অবৈধতা : مَيْسِرٌ-এর আভিধানিক অর্থ বণ্টন করা। يَاسِرٌ বলা হয় বণ্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বণ্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তি উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করা হতো; নিজেরা ব্যবহার করত না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হতো। বণ্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে এবং জাস্‌সাস 'আহকামুল কুরআনে' লিখেছেন যে, মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইবনে আব্বাস ইবনে ওমর (রা.), কাতাদা, মু'আবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রা.) বলেছেন, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مِنَ الْقِمَارِ اَلْمُخَاطَرَةُ লটারীরও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত।' জাসসাস ও ইবনে সিরীন বলেছেন– 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মাইসির এর অন্তর্ভুক্ত।' –[রূহুল বয়ান]

مُخَاطَرَةٌ 'মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মাইসির ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোনো মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপতি হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। –[শামী– ৫ : ৩৫৫] উদাহরণতঃ এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোনো একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণি অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মাইসির, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়– যেমন, যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কেননা এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমণশীল নয়; বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যে সীমিত।

এ জন্য সহীহ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে, কেননা এ সবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন যে, দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা অপেক্ষাও খারাপ। –[ইবনে কাছীর]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রূমের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কুরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কেসরার কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবূ বকর (রা.) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুজুর ﷺ ঘটনা শুনে খুশি হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো হালাল থাকাকালেও স্বীয় রাসূল ﷺ-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল রাসূল ﷺ-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রা.)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। হুজুর ﷺ জাফর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন তখন বলতে হয়। তা হচ্ছে এই, আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোনো দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভালো-মন্দ কোনোটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহেলিয়াত আমলেও আমি কোনো দিন মূর্তিপূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোনো দিনও জেনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোনো দিনও মিথ্যা কথা বলিনি। –[রূহুল বয়ান]

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি : জুয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশি। এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম লোকই অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমণশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যু এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা এতে উভয়পক্ষের লাভ লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত কর, যাতে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোনো কোনো মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 'মাইসির' বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'চার জনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ, দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে, অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেওয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মতো কিছুই হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েজ বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়া বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের ধন সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামি জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন ঘোষণা করেছে– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ 'সম্পদ বণ্টন করার যে নিয়ম কুরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মতো পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই কুরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ. 'শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়।

ফিকহ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম : এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে বুঝা গেল যে, কোনো বস্তু কিংবা কোনো কাজে দুনিয়ার সাময়িক উকার বা লাভ থাকলেই শরিয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা যে খাদ্য বা ঔষধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথা পৃথবীর সবচেয়ে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণসংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি, শরিয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, জেনা প্রতারণা এমন কি আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই? কেননা কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোনো বুদ্ধিমান এর ধারে কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব

কাজে তারাই বেশি লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এগুলোকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামি শরিয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

ফিকহের আর একটি আইন : এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ, কোনো একটি কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُحِبُّوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ভালোবাস।

لَا يَزَالُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلزَّوَالُ মূলবর্ণ (ز ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সর্বদা থাকবে।

يُقَاتِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা যুদ্ধ করবে।

يَرُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ফিরিয়ে দিবে।

اسْتَطَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সক্ষম হয়।

يَرْتَدِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ফিরে যায়।

حَبِطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَبْطُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– এটা নষ্ট হয়ে গেছে।

يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আশা করে, কামনা করে।

مَنَافِعُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَنْفَعَةٌ অর্থ– লাভ, ফায়েদা।

يُبَيِّنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب ـ ي ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে বয়ান করে।

تَتَفَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّفَكُّرُ মূলবর্ণ (ف ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চিন্তা কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ : এখানে اَلْفِتْنَةُ মুবতাদা اَكْبَرُ শিবহে ফে'ল مِنَ الْقَتْلِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলাহ হয়ে খবর, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : এখানে هُمْ টি মুবতাদা فِيْهَا জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম। خٰلِدُوْنَ শিবহে ফে'ল। শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হলো।

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٠)

অনুবাদ : (২২০) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারে, আর মানুষ আপনাকে এতিমদের [ব্যবস্থা] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর শ্রেয়, আর যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যয়বিধান একত্রই রাখ, তবে তারা তোমাদের ভাই, আর আল্লাহ তা'আলা স্বার্থ-নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষাকারীকে জানেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٢١)

(২২১) আর বিবাহ করো না কাফের নারীদেরকে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত। আর মুসলমান দাসী কাফের রমণী হতে উত্তম, যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, আর নারীদেরকে কাফের পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত, আর মুসলমান দাসও কাফের পুরুষের চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, তারা দোজখের প্রেরণা দেয়, আর আল্লাহ জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি প্রেরণা দেন স্বীয় বিধান দ্বারা, আর আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে স্বীয় বিধানসমূহ এই জন্য বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ মতো কাজ করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২০) فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারে وَيَسْـَٔلُوْنَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْيَتٰمٰى এতিমদের সম্বন্ধে قُلْ আপনি বলে দিন اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর শ্রেয় وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ আর যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যয়বিধান একত্রই রাখ فَاِخْوَانُكُمْ তবে তারা তোমাদের ভাই وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা জানেন الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ স্বার্থ-নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষাকারীকে وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করলে لَاَعْنَتَكُمْ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী حَكِيْمٌ বিজ্ঞানময়।

(২২১) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ আর বিবাহ করো না কাফের নারীদেরকে حَتّٰى يُؤْمِنَّ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ আর মুসলমান দাসী خَيْرٌ উত্তম مِّنْ مُّشْرِكَةٍ কাফের রমণী হতে وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ আর নারীদেরকে কাফের পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না। حَتّٰى يُؤْمِنُوْا মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ আর মুসলমান দাসও خَيْرٌ উত্তম مِّنْ مُّشْرِكٍ কাফের পুরুষের চেয়ে وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ তারা দোজখের প্রেরণা দেয় وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا আর আল্লাহ প্রেরণা দেন اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি بِاِذْنِهٖ স্বীয় বিধান দ্বারা وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ আর আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে স্বীয় বিধানসমূহ এই জন্য বর্ণনা করেন لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ মতো কাজ করে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (٢٢٢)

অনুবাদ : (২২২) আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, তা অপবিত্র বস্তু, সুতরাং ঋতুকালে তোমরা স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক, আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পাক না হওয়া পর্যন্ত, অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পাক হবে, তখন তাদের নিকট যাতায়াত কর যে স্থান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন তওবাকারীগণকে আর মহব্বত করেন পবিত্রাচারীদেরকে।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٢٣)

(২২৩) তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ, সুতরাং স্বীয় শস্যক্ষেত্রে আগমন কর যেদিক দিয়ে ইচ্ছা, আর ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কিছু [নেক কাজ] করতে থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়, তোমাদেরকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হতে হবে, আর এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٢٤)

(২২৪) আর স্বীয় কসমসমূহ দ্বারা আল্লাহ [-এর নাম]-কে প্রতিবন্ধক বানিওনা। এ সমস্ত কাজের যে, তোমরা কোনো নেক কাজ করবে এবং পরহেজগারী করবে ও মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে, আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২২) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে قُلْ هُوَ اَذًى আপনি বলে দিন, তা অপবিত্র বস্তু فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ সুতরাং তোমরা স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক فِي الْمَحِيْضِ ঋতুকালে وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না حَتّٰى يَطْهُرْنَ পাক না হওয়া পর্যন্ত فَاِذَا تَطَهَّرْنَ অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পাক হবে فَاْتُوْهُنَّ তখন তাদের নিকট যাতায়াত কর مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ যে স্থান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন التَّوَّابِيْنَ তওবাকারীগণকে وَيُحِبُّ আর মহব্বত করেন الْمُتَطَهِّرِيْنَ পবিত্রাচারীদেরকে।

(২২৩) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ সুতরাং স্বীয় শস্যক্ষেত্রে আগমন কর اَنّٰى شِئْتُمْ যেদিক দিয়ে ইচ্ছা وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ আর ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কিছু [নেক কাজ] করতে থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَاعْلَمُوْٓا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ নিশ্চয় তোমাদেরকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হতে হবে وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

(২২৪) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ [-এর নাম]-কে বানিওনা عُرْضَةً প্রতিবন্ধক لِّاَيْمَانِكُمْ স্বীয় কসমসমূহ দ্বারা اَنْ تَبَرُّوْا এ সমস্ত কাজের যে, তোমরা কোনো নেক কাজ করবে وَتَتَّقُوْا এবং পরহেজগারী করবে وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ও মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২২০) قوله وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। যখন পবিত্র কুরআনের এ দুটি আয়াত নাজিল হলো– اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى এবং وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যাদের ঘরে এতিম ছিল, তারা এতিমদের খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল। তাদের জন্য আলাদা খাবার তৈরি করতেন এবং খাওয়া শেষে যা অবশিষ্ট থেকে যেত তা রেখে দিয়ে তাদেরকেই খাওয়াতেন। কিংবা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু নিজেরা তার কিছুই স্পর্শ করতেন না। এভাবে বিষয়টি তাদের জন্য বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াল। তখন তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে পেশ করলে এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(২২১) قوله وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুকাতেল বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ইবনে আবি খারছা গানাভী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে জনৈক মুশরিকা মেয়েকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলেন মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

(২২২) قوله وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইহুদিদের মাঝে এ প্রথা ছিল যে, তাদের নারীদের [হায়েজ] ঋতুস্রাব হলে তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া উঠা বসা সব বন্ধ করে দিত। অন্য দিকে খ্রিস্টানরা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম অর্থাৎ তারা খাওয়া দাওয়া উঠাবসা স্ত্রীগমন সব করত। একবার ছাবিত বিন ওহদাহ রাসূলে কারীম ﷺ -কে হায়েজা নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, যে হায়েজ [ঋতুস্রাব] অবস্থায় আমরা নারীদের সাথে কেমন আচরণ করব তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র তাফসীরে আহমদী : ৭০]

(২২৩) قوله نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোই এই আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে। ১. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত ইহুদিরা বলত কেউ যদি পিছনের দিক থেকে [যোনীদ্বার] দিয়ে স্ত্রী সঙ্গম করে তবে সন্তান ট্যারা চোখ বিশিষ্ট হয় তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন একদিন হযরত ওমর (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো হালাক হয়ে গেছি, তিনি বললেন, কিসে তোমাকে হালাক করল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাতে আমার বাহনটি উল্টো করে ব্যবহার করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ তাকে কোনো উত্তর দিলেন না তখন উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। তাতে বলা হয়েছে যে, সামনের দিক থেকে ও পিছনের দিক থেকে উভয়ভাবে স্ত্রী গমন করা যাবে তবে মলদ্বার এবং হায়েজ অবস্থা থেকে বেঁচে থাকবে। –[তিরমিযী : ২]

(২২৪) قوله وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : মেছতাহ নামক এক ব্যক্তি ছিল যাকে হযরত আবূ বকর (রা.) দান দক্ষিণা করতেন। সে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে জড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আল্লাহর নামে কসম খেয়েছেন যে, মেছতাহকে কোনো দান দক্ষিণা করবেন না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قوله وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ الخ যে জাতিকে তাদের প্রথা পদ্ধতিতে আসমানি কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েজ নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রিস্টান বা নাসারা মনে করে, অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোনো কেনো আকীদা সম্পূর্ণ মুশরিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত কিংবা আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিলকেও আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহলে কিতাব ঈসায়ী নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ–খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েজ নয়। আর যদি হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেওয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

মুসলমান ও কাফেরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফের নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালোবাসা, নির্ভারশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকের আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়ে যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মতো চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মুশরিক শব্দ দ্বার সাধারণ অমুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশে অন্তর্ভুক্ত নয়। ইরশাদ হয়েছে : وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। যারা কোনো নবী কিংবা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণটি তো আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলমানের বেলায়ই প্রযোজ্য হয়, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে, তাওহীদ, পরকাল ও রিসালাত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শিরক পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুজুর ﷺ-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়তঃ কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েজ করা হলেও তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েজ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বুঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে; বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোনো অনিয়ম বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার নিজস্ব ত্রুটি।

চতুর্থতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েজ হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোনো কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থবুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফের না হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ কিতাবী ইহুদি ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমান বিবাহের জন্য দীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোনো অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমানদের মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ। –[কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ]

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী, ইহুদি ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা 'হাদীসে দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত ওমর ফারুক (রা.) সুদূর প্রসারী দৃষ্টি শক্তি বৈবাহিক ব্যাপারে সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশ দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদি ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদমশুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদি কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খ্রিস্টান ও ইহুদি মতের সাথে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতঃই ধর্ম বিবর্জিত। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কেও মানে না, তাওরাতেকেও মানে না, এমনকি আল্লাহর অস্তিত্বও মানে না, পরকালককেও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কুরআনি আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপেই হারাম। বিশেষতঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আয়াতে যাদের বুঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদি নাসারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলমানদের মতো তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

হায়েযা অবস্থায় মহিলাদের থেকে দূরে থাকার বিধান : হায়েযা অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর কোন্ কোন্ অঙ্গ থেকে দূরে থাকবে এবং কোন্ কোন্ অঙ্গ থেকে উপকার নিতে পারবে এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ নিম্নরূপ–

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, স্ত্রীর পূর্ণ শরীর থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ বলেছেন, কোনো অঙ্গ বা অংশকে خَاصّ করেননি।

(২) আহনাফ ও মালেকের মতে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশটুকু নিষিদ্ধ। কেননা নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশার সাথে এরূপ করেছেন।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু যৌনাঙ্গ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, حَلَّ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْجِمَاعُ

اَلْمَحِيْض **-এর অর্থ :** مَحِيْض অর্থ যখন حَيْض হয়, তখন এটা মাসদার। কারো মতে ইসম। কারো মতে এটা حَيْض -এর স্থান ও কালের রূপক নাম। এর মূল অর্থ প্রবাহিত হওয়া। এ অর্থে حَوْض বলা হয়। কেননা পানি তাতে প্রবাহিত হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

হায়েযের সময় : ওলামায়ে কেরাম হায়েযের মুদ্দাত নিয়ে মতভেদ করেছেন। যেমন–

(ক) ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মতে কমপক্ষে তিন দিন আর উর্ধ্বে দশ দিন। কেননা হাদীস শরীফে আছে– اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ

(খ) ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেন, কমপক্ষে একদিন আর উর্ধ্বে পনেরো দিন।

(গ) ইমাম মালেকের মতে বেশি ও কমের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। এটা মহিলার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

ঋতুস্রাবাবস্থায় সঙ্গমের কাফ্ফারা : কোনো লোক ভুলবশত ঋতুস্রাবাবস্থায় রতিক্রিয়া করে ফেললে ইমাম আহমদের মতে অর্ধেক দিনার কাফফারা দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও জমহুর ওলামার মতে এরূপ কাজে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে এহেন অশালীন কাজের জন্য খাঁটি তওবা করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

قوله فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ -এর অর্থ : তোমরা মেয়েদের হায়েযা অবস্থায় তাদের সাথে মেলামেশা করবে না। দূরে থাকবে অথবা হায়েযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এখানে اِعْتِزَالٌ অর্থ– সঙ্গম না করা। তবে উঠাবসা ও স্পর্শ করা জায়েজ, বরং লজ্জাস্থান ছাড়া বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ফায়দা গ্রহণ করা বৈধ। –[ফাতহুল কাদীর]

حَرْثٌ -এর তাৎপর্য : حَرْثٌ শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীর যোনি ছাড়া কোনো রাস্তায় সঙ্গম করা বৈধ নয়। কেননা এটা সন্তান-সন্ততি এবং বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্র। যেমনিভাবে ক্ষেত শস্য উৎপাদনের স্থান। উভয়টির মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে। জমিনে বীজ বপন করলে চারা গজায়, এমনিভাবে জরায়ুতে বীর্য রাখলে সন্তান জন্মে। অতএব যে স্থানে বীর্য রাখলে সন্তান জন্মিবে না, সে স্থানে সঙ্গম বৈধ হতে পারে না। –[ফাতহুল কাদীর]

قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -এর ব্যাখ্যা : মোল্লা জীয়ন তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এখানে اَنّٰى শব্দটি كَيْفَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, সহবাস প্রক্রিয়ায় ইচ্ছামতো স্ত্রীর সাথে সঙ্গম কর। চাই তা স্ত্রীর পিছনে থেকে সামনের রাস্তা দিয়ে হোক, অথবা বসিয়ে, চিৎ করে শুইয়ে, দাঁড়িয়ে, স্ত্রীকে নিচে রেখে বা বুকের উপরে রেখে, যেভাবে ইচ্ছে ও সুবিধা হয় সেভাবে সহবাস কর। কারণ তাদের ব্যবহারের পদ্ধতিতে তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো, সর্বাবস্থায় স্ত্রীর যোনি পথে সঙ্গম করতে হবে।

قوله وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ -এর মর্মার্থ : এর অর্থ হলো– তোমরা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগবিলাস, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি নিয়ে আনন্দে মত্ত থেকো না; বরং আখেরাতে অনন্ত সুখ লাভের জন্য নেক আমল থেকে কিছু আগে ভাগেই আল্লাহর কাছে প্রেরণ কর, যাতে তা তোমাদের জন্য আখেরাতে কাজে আসে। অথবা, এর অর্থ হলো নিজের বংশ রক্ষার চেষ্টা করো যেন এরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং তাদেরকে উন্নত ইসলামি চরিত্র ও দীন ইসলাম শিক্ষা প্রদান করবে। অথবা, এর অর্থ হলো, সঙ্গম প্রক্রিয়ায় নিজেদের কল্যাণার্থে পূর্বাহ্নে বিসমিল্লাহ পড়ে নিও।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা জিজ্ঞাসা করবে।

تُخَلِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَة মূলবর্ণ (خ . ل . ط) মাসদার المخالطة জিনস صحيح অর্থ– তোমরা একত্রিত করে নাও।

شَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– সে চেয়েছে।

اَعْنَتَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْنَاتُ মূলবর্ণ (ع . ن . ت) জিনস صحيح অর্থ– সে কষ্ট দিয়েছে।

لَاتُنْكِحُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْكَاحُ মূলবর্ণ (ن . ك . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিবাহ করো না।

يَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আহবান করবে।

يَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

تَطَهَّرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّطَهُّرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা পবিত্র হয়েছে।

فَأْتُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তোমরা আস।

يُحِبُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاَحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে মহব্বত করে।

التَّوَّابِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل مبالغة বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবাকারীগণ।

مُلٰقُوْ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اَلْمُفَاعَلَةُ মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাৎকারীগণ।

تَبَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبِرُّ মূলবর্ণ (ب . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা সৎকাজ করবে।

تَتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা আত্মসংযম করবে।

وَتُصْلِحُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মূলবর্ণ (ص . ل . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শান্তি স্থাপন করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ : এখানে وَاوْ টি হরফে আতফ, আর ل টি তাকীদের জন্য ব্যবহৃত। عَبْدٌ মাওসূফ مُؤْمِنٌ সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, خَيْرٌ টি শিবহে ফে'ল مِنْ مُّشْرِكٍ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলাহ হয়ে খবর, অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ : এখানে اُولٰٓئِكَ টি মুবতাদা يَدْعُوْنَ ফে'ল এতে هُمْ যমীর ফা'য়েল اِلَى النَّارِ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। ফে'ল ও ফা'য়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হলো।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ (২২৫) আল্লাহ কৈফিয়ত চাবেন না। তোমাদের শপথসমূহের মধ্যে অযথা শপথের জন্য, কিন্তু কৈফিয়ত চাবেন তার যা তোমাদের অন্তরসমূহ [মিথ্যা বলার] ইচ্ছা করেছে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٢٥)
(২২৬) যারা কসম করে বসে স্বীয় পত্নীদের সাথে [তাদের নিকট না যাওয়ার] তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে, অতএব, তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন, অনুগ্রহ করবেন।	لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاۗءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٢٦)
(২২৭) আর যদি একেবারে পরিত্যাগ করারই দৃঢ় সঙ্কল্প করে থাকে, তবে আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন, জানেন।	وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٢٧)
(২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ বিরত রাখবে নিজেদেরকে তিন ঋতু পর্যন্ত, আর সেই নারীদের জন্য হালাল নয় গোপন করা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক তাদের জরায়ুর মধ্যে যদি ঐ নারীগণ আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, আর তাদের স্বামীগণ তাদেরকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার রাখে ঐ ইদ্দতের মধ্যে, যদি ইচ্ছা করে পরস্পরে সদ্ভাবে থাকার, আর নারীদেরও [পুরুষদের উপর] তদ্রূপ দাবি আছে যদ্রূপ ঐ নারীদের উপর [পুরুষদের দাবি] আছে [শরিয়তের] নিয়ম অনুযায়ী, আর পুরুষদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে নারীদের উপর; আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।	وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۗءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(২২৫) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ কৈফিয়ত চাবেন না بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথসমূহের মধ্যে অযথা শপথের জন্য وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ কিন্তু কৈফিয়ত চাবেন তার بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ যা তোমাদের অন্তরসমূহ [মিথ্যা বলার] ইচ্ছা করেছে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল حَلِيْمٌ সহিষ্ণু।

(২২৬) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ যারা কসম করে বসে مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ স্বীয় পত্নীদের সাথে تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। فَاِنْ فَاۗءُوْ অতএব, তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করে দিবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(২২৭) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ আর যদি একেবারে পরিত্যাগ করারই দৃঢ় সঙ্কল্প করে থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ তবে আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন عَلِيْمٌ জানেন।

(২২৮) وَالْمُطَلَّقٰتُ আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ বিরত রাখবে নিজেদেরকে ثَلٰثَةَ قُرُوْۗءٍ তিন ঋতু পর্যন্ত وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ আর সেই নারীদের জন্য হালাল নয় اَنْ يَّكْتُمْنَ গোপন করা مَا خَلَقَ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন اللّٰهُ আল্লাহ পাক فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ তাদের জরায়ুর মধ্যে اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ যদি ঐ নারীগণ ঈমান রাখে بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি وَبُعُوْلَتُهُنَّ আর তাদের স্বামীগণ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ তাদেরকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার রাখে فِيْ ذٰلِكَ ঐ ইদ্দতের মধ্যে اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا যদি ইচ্ছা করে পরস্পরে সদ্ভাবে থাকার وَلَهُنَّ আর নারীদেরও তদ্রূপ দাবি আছে مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ যদ্রূপ ঐ নারীদের উপর আছে بِالْمَعْرُوْفِ নিয়ম অনুযায়ী وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ আর পুরুষদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে নারীদের উপর وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٢٩)

অনুবাদ : (২২৯) এই তালাক দুইবার, অতঃপর রাখা নিয়মানুযায়ী অথবা বর্জন করা সদ্ভাবে, আর তোমাদের জন্য তা হালাল নয় যে, গ্রহণ কর সামান্য কিছুও তা হতে যা তোমরা [মহরানা স্বরূপ] তাদেরকে দিয়েছিলে, অনন্তর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না; অতএব, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, উভয়ে আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রেখে চলতে পারবে না, তবে উভয়েরই কোনো পাপ হবে না, ঐ বিনিময় গ্রহণে যা প্রদান করে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করে নেয়, এটা আল্লাহর বিধানসমূহ সুতরাং তোমরা এর সীমালঙ্ঘন করো না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানসমূহের সীমালঙ্ঘন করে, বস্তুত এরূপ লোকই নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২৯) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ এই তালাক দুইবার فَاِمْسَاكٌ অতঃপর রাখা بِمَعْرُوْفٍ নিয়মানুযায়ী اَوْ تَسْرِيْحٌ অথবা বর্জন করা بِاِحْسَانٍ সদ্ভাবে وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য তা হালাল নয় اَنْ تَاْخُذُوْا যে গ্রহণ কর مِمَّاۤ তা হতে যা اٰتَيْتُمُوْهُنَّ তোমরা [মহরানা স্বরূপ] তাদেরকে দিয়েছিলে شَيْئًا সামান্য কিছুও اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ অনন্তর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না فَاِنْ خِفْتُمْ অতএব, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ উভয়ে আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রেখে চলতে পারবে না فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তবে উভয়েরই কোনো পাপ হবে না فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ঐ বিনিময় গ্রহণে যা প্রদান করে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করে নেয় تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর বিধানসমূহ فَلَا تَعْتَدُوْهَا সুতরাং তোমরা এর সীমালঙ্ঘন করো না وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানসমূহের সীমালঙ্ঘন করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ বস্তুত এরূপ লোকই নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২২৬) قوله لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রা.) বর্ণনা করেন, ইসলামের পূর্ব যুগের লোকেরা স্ত্রীদেরকে মানসিক কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করত কিন্তু তালাক দিত না। যেন সে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। এ প্রথাকে ঈলা বলা হয়। এ ধরনের নিষ্ঠুর প্রথা বিলোপ করণার্থে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(২২৮) قوله وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) বলেন, যখন রাসূল ﷺ -এর যুগে আমি তালাকপ্রাপ্তা হলাম তখন তালাকপ্রাপ্তা নারীদের কোনো ইদ্দত ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[মুখতাসার ইবনে কাছীর : ২০২]

(২২৯) قوله اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইসলামের প্রথম যুগে লোকেরা তার স্ত্রীদেরকে অসংখ্যবার তালাক দিত। এবং নারীদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইদ্দতের ভিতরে তাকে পুনরায় গ্রহণ করে নিত। একবার এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে তালাকও দিব না যে আমার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর কোনো দিন তোমার পাশেও আসব না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল কিভাবে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিয়ে দিব যখনই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে ফিরিয়ে নিব। মহিলা গিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করল তখন এ আয়াত নাজিল হলো।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে জুরাইয (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবেত বিন কায়েস ও হাবিবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাবিবা তার স্বামীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর দরবারে অভিযোগ করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে [মহররূপে] নেওয়া বাগানটি ফিরিয়ে দিবে? তিনি সম্মতি জানালেন, তখন নবী করীম ﷺ স্বামীকে ডেকে এ প্রস্তাব শুনালেন। স্বামী আরজ করলেন, সেটি কি আমার জন্য হালাল হবে? ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। স্বামী আরজ করলেন, তাহলে আমি তাই করে নিলাম। তখন এ আয়াত নাজিল হলো। –[লুবাব, ইবনে জারীর]

(২২৯) قوله وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম ইবনে কাছীর ও তাবারী বর্ণনা করেন, একদিন এক মহিলা যার নাম জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ, আর বুখারীর বর্ণনায় জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং আবূ দাউদের বর্ণনায় হাফসা বিনতে সাহল রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে তার স্বামী সাবিত ইবনে কায়স সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং মুখে চপেটাঘাতের চিহ্ন দেখায়। অতঃপর বলে যে, আমি তার ঘরে থাকব না। রাসূল ﷺ সাবিতকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। রাসূল (সা.) জামিলাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমার স্বামী সদ্ব্যবহারে অন্যান্য পুরুষদের তুলনায় অতুলনীয়; কিন্তু তার প্রতি আমার স্বাভাবিক ঘৃণা রয়েছে। কারণ সে বেটে, কালো এবং কুৎসিত। তাই আমাকে পৃথক করে দিন। রাসূল ﷺ জামিলাকে বললেন, যে বাগানটি তোমাকে সাবিত মহর হিসেবে দান করেছে, তা কি ফেরত দিবে? জামিলা বলল, বাগান কেন, আমি এর চেয়েও বেশি দিতে প্রস্তুত। রাসূল ﷺ বললেন, মোহর থেকে বেশি নেওয়া যাবে না। তারপর রাসূল ﷺ সাবিতকে বললেন, বাগান ফিরিয়ে নাও এবং এর পরিবর্তে তাকে তালাক দিয়ে দাও। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

يَمِيْنٌ বা শপথের সংজ্ঞা : يَمِيْنٌ [ইয়ামীন]-এর আভিধানিক অর্থ শপথ করা, আর পরিভাষায় কোনো কাজ না করার বা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ [দৃঢ় অঙ্গীকার] করা।

শপথের প্রকারভেদ : শপথ ৩ প্রকার ঃ (১) গুমূস (২) মুনআক্বিদাহ (৩) লাগব।

(১) **গুমূস :** অতীত বিষয় সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করাকে গুমূস বলে। এ ধরনের মিথ্যা শপথ করা মারাত্মক গুনাহ। তার জন্য তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরি কিন্তু কোনো প্রকার কাফফারা জরুরি নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ প্রকার কসমেরও কাফফারা দিতে হয়।

(২) **মুনআক্বিদাহ :** ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ করা বা না করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করা। এ ধরনের শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

(৩) **লাগব :** কোনো অতীত বিষয় সম্বন্ধে অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে মিথ্যা শপথ করাকে লাগব বলে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও বিশিষ্ট সম্প্রদায়গণ বলেন, কোনোরূপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কথায় কথায় আল্লাহর নামে শপথ করাকে লাগব বলে, এতে কোনো প্রকার গুনাহও নেই কাফফারাও দিতে হয় না।

শপথের কাফফারা : কসমের কাফফারা তিনটি। এর মধ্যে হতে যে কোনো একটি আদায় করতে হবে। (১) تَحْرِيْرُ رَقَبَةٌ অর্থাৎ একজন গোলাম আজাদ করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গোলাম বা ক্রীতদাস মুসলমান হতে হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে গোলাম মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। (২) كِسْوَةٌ অর্থাৎ দশজন মিসকিনকে অন্তত সতর ঢাকার পরিমাণ এবং পরিধানের উপযোগী কাপড় দান করা। (৩) اِطْعَامٌ অর্থাৎ দশ জন মিসকিনকে দু'বেলা তৃপ্তিজনক আহার করানো।

উপরিউক্ত তিনটি বিধানের কোনো একটি পালন করার সামর্থ্য না থাকলে একাধিকক্রমে তিনটি রোজা রাখা। কিন্তু সামর্থ্য থাকা অবস্থায় রোজা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না।

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাসআলা :

১. চরম যৌন উত্তেজনবশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভালো করে তওবা করে নেওয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।

২. পশ্চাদ পথে [অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে] নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

৩. 'লাগব-কসম' এর দু'টি অর্থ– একটি হচ্ছে এই যে, কোনো অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মতো সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণতঃ নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে' কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোনো ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসল যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কসম' বেরিয়ে গেছে এরকম, এতে কোনো পাপ হবে না। আর সে জন্য একে 'লাগব' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোনো জবাবদিহী করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহীর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গুমূস', এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের প্রেক্ষিতে কোনো কাফফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগব' কসমের জন্যও কোনো কাফফারা নেই। এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'লাগব' এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগব' [অহেতুক] এজন্য বলা হয় যে, এতে পার্থিব কেনো কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে 'গুমূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোনো রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকিদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফফারা দিতেই হবে।

৪. যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে–

- প্রথমতঃ কোনো সময় নির্ধারণ করল না।
- দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখল।
- তৃতীয়তঃ চার মাসের বেশি সময়ের শর্ত আরোপ করল। অথবা
- চতুর্থতঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল। বস্তুতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় দিকগুলোকে শরিয়তে ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে। তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনঃবার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েজ হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। –[বয়ানুল কুরআন]

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরিয়তী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। এ আয়াতের পূর্বাপর কয়েকটি রুকূ'তে এ মূলনীতিই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা : ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থি জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কম-বেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরো একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসের রূপ পরিগ্রহ করে।

কুরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।
প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; "যেহেতু আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।"

ইসলামপূর্ব সামজে নারীর স্থান : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মতো তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মিরাশের অধিকারিণী হতো না; বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন, কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিলনা। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করত না।
ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা জান্নাতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোনো কোনো সংসদে পরস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলিণ্যের কারণ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটিই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না। 'হযরত রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরজ করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরক স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোনো ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেতনা-ফ্যাসাদের মূল কারণ : স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে

সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়াবিবাদ এবং নানা রকমের ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কুরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর ঊর্ধ্বে। অন্যকথা বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফ্যাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে– اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ, "মূর্খ লোক কখনো মধ্যপন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে।" বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিক চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোনো কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল ﷺ -এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাসআলা : এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কুরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য : সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেওয়া হয়নি; বরং তা পালন করাও ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা আল্লাহর নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মতো স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোনো কোনো স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য।

উল্লিখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে।" এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। তাই مِثْل শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, কুরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মতো বিরাট বিষয়কে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কেননা এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত] এ বাক্য শেষে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ 'মারুফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরিয়ত অনুযায়ী নাজায়েজ নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচিলত প্রথানুযায়ী যাতে কোনো রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথা-প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েজ হবে না। যথা বদমেজাজী অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দ্বারা এসব ব্যাপারই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে– وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশি মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নিবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। –[কুরতুবী]

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কুরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বুঝবার জন্য প্রথমে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক : বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও ইবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধন ও বটে, যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না।

প্রথমতঃ যে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে যে কোনো পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্ত্রীলোকের বিয়ে কোনো কোনো পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ বিয়ে ব্যতীত অন্যসব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি একজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও

দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোনো নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয়পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরিয়তের বিধানমতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে– যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'ইজাব ও কবুল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হলো, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্তাবলি ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেন-দেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা ইবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের অনেক দলিল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বুঝায়। ইসলামি শরিয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে ইবাদতের গুরুত্ব বেশি দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশি, যেভাবে খুশি তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না; বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মতো কোনো অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন প্রগাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে। حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত বড় আজাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্য ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামি শরিয়ত অন্যান্য ধর্মে মতো বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে, এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক, বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশি তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ অর্থাৎ, "আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।"

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। এ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতেই ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ, যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু

অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দত গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেওয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মতো নয়। বৈষয়িক চুক্তির মতো বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকি থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না; বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোনো অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে ইরশাদ হয়েছে– اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ অর্থাৎ, তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না; বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহবন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুতঃ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, হয় শরিয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেওয়া হবে, যাতে সে [স্ত্রী] মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না আবার তার অধিকার আদায় করারও কোনো চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। কুরআন মাজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে– وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

অর্থাৎ, "তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেওয়া অর্থ-সম্পদ বা মহর ফেরত নেওয়া হালাল নয়।"

শব্দ বিশ্লেষণ

يُؤْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْلَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ل ـ و) জিনস مهموز فاء ও ناقص واوى মুরাক্কাব অর্থ– তারা শপথ করে।

فَآءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَيْئُ মূলবর্ণ (ف ـ ى ـ ء) জিনস اجوف يائى ও مهموز لام মুরাক্কাব, অর্থ– তারা প্রত্যাবর্তন করেছে।

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস مهموز فاء এবং ناقص يائى মুরাক্কাব; অর্থ– তাদেরকে দিয়েছ।

يَخَافَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা [দুজন] ভয় করে।

يُقِيْمَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা [দুজন] কায়েম করে।

افْتَدَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ফিদিয়া দিল।

لَاتَعْتَدُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

يَتَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعل মাসদার اَلتَّعَدِّىْ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ : এখানে لَا يُؤَاخِذُ ফে'ল كُمْ টি مفعول আর اَللّٰهُ শব্দটি فاعل এবং بِاللَّغْوِ টি جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে لَا يُؤَاخِذُ -এর সঙ্গে আর فِىْ اَيْمَانِكُمْ টি جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য شبه فعل -এর সাথে। এর পর شبه فعل তার متعلق সহ حال এবার فعل . فاعل . مفعول . حال মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ হলো اِنَّ -এর اسم আর سَمِيْعٌ ও عَلِيْمٌ প্রতিটি اِنَّ-এর خبر সুতরাং اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَاللهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ : এখানে و টি حرف عطف আর اَللّٰهُ হলো مبتدأ এবং غَفُوْرٌ ও حَلِيْمٌ প্রতিটি خبر এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ الخ : এখানে و টি حرف عطف আর اَلْمُطَلَّقٰتُ শব্দটি مبتدأ আর يَتَرَبَّصْنَ ফে'ল এতে هُنَّ হলো ضمير فاعل আর باء হলো حرف جار এবং اَنْفُسَ হলো مضاف আর هُنَّ হচ্ছে مضاف اليه এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور আর جار ও مجرور মিলে متعلق এবং ثَلٰثَةَ হচ্ছে مضاف আর قُرُوْٓءٍ হলো مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه হয়েছে। তারপর فعل ـ فاعل ـ مفعول فيه ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে গেছে।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٢٣٠)

অনুবাদ (২৩০) অনন্তর যদি কেউ [তৃতীয়] তালাক দেয় স্ত্রীকে, তবে এই স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে না এর পর যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হয়, অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না যথারীতি পরস্পর পুনর্মিলনে যদি উভয়ের দৃঢ় ধারণা হয়, আল্লাহর কানুন কায়েম রাখতে পারবে, আর এই সমস্ত আল্লাহর বিধান, আল্লাহ তা বর্ণনা করেন এরূপ লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٣١)

(২৩১) আর যখন তোমরা তালাক প্রদান কর স্ত্রীদেরকে, অতঃপর তারা নিকটবর্তী হয় স্বীয় ইদ্দত শেষ হওয়ার, তখন হয়তো নিয়মানুযায়ী তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে থাকতে দাও অথবা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মুক্তি দাও, এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রেখো না এই ইচ্ছায় যে, তাদের প্রতি অত্যাচার করবে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে বস্তুত, সে নিজেরই ক্ষতি করবে, আর আল্লাহর হুকুমসমূহকে খেল-তামাশা মনে করো না, আর আল্লাহর নিয়ামতকে যা তোমাদের প্রতি রয়েছে স্মরণ কর, আর সেই কিতাব ও হিকমতকে যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই হিসেবে নাজিল করেছেন যে, তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করছেন, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খুব ভালোভাবে জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩০) فَإِنْ طَلَّقَهَا অনন্তর যদি কেউ তালাক দেয় স্ত্রীকে فَلَا تَحِلُّ لَهُ তবে এই স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে না حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এর পর যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হয় فَإِنْ طَلَّقَهَا অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ তবে তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না أَنْ يَّتَرَاجَعَآ যথারীতি পরস্পর পুনর্মিলনে إِنْ ظَنَّآ যদি উভয়ের দৃঢ় ধারণা হয় أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ আল্লাহর কানুন কায়েম রাখতে পারবে وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ আর এই সমস্ত আল্লাহর বিধান يُبَيِّنُهَا আল্লাহ তা বর্ণনা করেন لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ এরূপ লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।

(২৩১) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ আর যখন তোমরা তালাক প্রদান কর স্ত্রীদেরকে فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ অতঃপর তারা নিকটবর্তী হয় স্বীয় ইদ্দত শেষ হওয়ার فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ তখন হয়তো নিয়মানুযায়ী তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে থাকতে দাও أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ অথবা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মুক্তি দাও। وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রেখো না وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ বস্তুত, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। وَلَا تَتَّخِذُوْا আর মনে করো না اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমসমূহকে। هُزُوًا খেল-তামাশা। وَاذْكُرُوْا আর স্মরণ কর نِعْمَتَ اللّٰهِ আল্লাহর নিয়ামতকে عَلَيْكُمْ যা তোমাদের প্রতি রয়েছে وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই হিসেবে নাজিল করেছেন যে يَعِظُكُمْ بِهٖ তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করছেন وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। وَاعْلَمُوْٓا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খুব ভালোভাবে জানেন।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٢٣٢)

(২৩২) আর যখন তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া যায় যে, তারা স্বীয় পত্নীগণকে তালাক দিয়েছে তৎপর সেই স্ত্রীগণ স্বীয় নির্ধারিত সময় [ইদ্দত]-ও পূর্ণ করে ফেলে, তখন তোমরা তাদেরকে এই কাজে বাধা দিও না যে, তারা স্বীয় স্বামীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, যখন পরস্পর সকলে সম্মত হয়ে যায় নিয়মানুযায়ী, এই বিষয় দ্বারা নসিহত করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, এই নসিহত কবুল করা তোমাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয়, আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩২) وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ আর যখন তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া যায় যে, তারা স্বীয় পত্নীগণকে তালাক দিয়েছে فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ তৎপর সেই স্ত্রীগণ স্বীয় নির্ধারিত সময় [ইদ্দত]-ও পূর্ণ করে ফেলে فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ তখন তোমরা তাদেরকে এই কাজে বাধা দিও না اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ যে তারা স্বীয় স্বামীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ যখন পরস্পর সকলে সম্মত হয়ে যায় নিয়মানুযায়ী ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ এই বিষয় দ্বারা নসিহত করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ এই নসিহত কবুল করা তোমাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয় وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩০) قوله فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমরআতে রেফায়া অর্থাৎ হযরত আয়েশা বিনতে আবদির রহমান এর প্রথম বিবাহ হয় তারই চাচাতো ভাই রিফায়া বিন ওহাব বিন উতাইকের সাথে। পরে সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় অতঃপর আব্দুর রহমান বিন সুবাইর কুরাবীর সাথে তার বিয়ে হয়, দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে এসে আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্দুর রহমান আমাকে মিলনের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছে এখন কি আমি পূর্বের স্বামী রেফায়ার কাছে বিবাহ বসতে পারব? হুজুর ﷺ বললেন, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান এর সাথে তোমার মিলন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[বায়যাবী– ১ : ১৫৫, মুখতাসার ইবনে কাসীর – ১ : ২০৮]

(২৩১) قوله وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ছাবেত বিন ইয়াসার নামক জনৈক আনসারী সাহাবী তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দিলেন। অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পূর্বে তাকে ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দিলেন এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আরো এক তালাক দিয়ে দিলেন। যদ্দরুন বিবির প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল এভাবে তালাক দিয়ে নিছক তাকে কষ্ট দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য ছিল এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩১) قوله وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবুদ দরদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জাহেলিয়াতের যুগে কোনো কোনো স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অথবা বাদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়া কোনো আমার উদ্দেশ্যই ছিল না। তখনই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে তবুও তা কার্যকারী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। –[বায়যাবী– ১ : ১৫৬, ইবনে কাছীর– ১ : ২১০, মাআরেফুল কুরআন : ১২৮]

(২৩২) قوله وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ভগ্নিকে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাছে যতদিন জীবন যাপন করার করলেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ফিরিয়ে নেননি। কিন্তু এরপর স্বামীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন আর তার স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অন্যান্য প্রস্তাবকারীদের মধ্যে তিনিও তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন ভাই মাকাল (রা.) তাকে বলল হে ইতর, এই মহিলার মাধ্যমে তোমাকে আমি সম্মান দিয়েছিলাম তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহর কসম! তুমি আর কখনো তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এই তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ। রাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা জানতেন এই স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর টানের কথা এবং এই স্বামীর প্রতি ঐ মহিলার টানের কথা তখন আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

মাকাল এ আয়াত শোনার পর বললেন, আমার পরওয়ারদেগারের আদেশ শুনেছি এবং তা শিরোধার্য করে নিচ্ছি যে, এর পর তিনি উক্ত ভগ্নিপতিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন তোমার কাছে আমি আমার বোনকে পুনরায় বিয়ে দিচ্ছি আর আমি তোমার সম্মান করছি। –[তিরমিযী– ২ : ১১, মুখতাসার ইবনে কাছীর– ১ : ২]

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যাতে মহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে , তবে এমতাবস্থায় মহর ফেরত নেওয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েজ হবে। এই মাসআলা বর্ণনা করার পর ইরশাদ হয়েছে– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা এমতাবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোনো কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তিন তালাক ও তার বিধান : এ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরিয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ এরপর তৃতীয় তালাককে [যদি] শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে– এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ, তৃতীয় তালাক দেওয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে বিদ'আত বলেন। আর অন্যান্য ফকীহগণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়া জায়েজ বলেন। এসব ফকীহ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা; বরং বিদ'আত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরআন ও হাদীসের ইরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকে না, তখন তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে। ইদ্দত শেষে হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহগণ একে আহসান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহবাগীণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি শায়বা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহবন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

কুরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যায়। তবে مَرَّتٰنِ শব্দ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহুরে পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে। اَلطَّلَاقُ এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مَرَّتٰنِ শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কুরআনের শব্দে দুই বারের অর্থ হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া। –[রুহুল মা'আনী]

যাহোক, কুরআন মাজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহগণ একে সুন্নত তরিকা বলে অভিহিত করেছেন তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায় এবং এতে কোনো মতানৈক্য নেই। রাসূলে আকরাম ﷺ-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবিদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক এক সাথে দিয়েছে– এ সংবাদ রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগল। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে হত্যা করব?

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন। –[যাদুল মা'আদ] আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে কাছীর, ইবনে হাজার প্রমুখ সবাই এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহবৃন্দ তৃতীয় তালাককে নাজায়েজ ও বিদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমামগণ তিন তুহুরে তিন তালাক দেওয়াকে সুন্নত তরিকা বলে যদিও একে বিদ'আত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামি শরিয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে; বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়।

এতে আরো সুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভালো-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভালো মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভালো মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরিয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতোই রয়ে যায়। অর্থাৎ, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেওয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাত ছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে– فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ এতে দুটি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই; বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার জীবনযাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথা স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দিবে, যাতে বিবাহ-বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ বলা হয়েছে। تَسْرِيْحٌ অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র.) আবূ রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন, কুরআন مَرَّتٰنِ বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক।–[রূহুল মা'আনী] অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্ম পদ্ধতিও তাই করে যা ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে اِمْسَاكٌ -এর সাথে بِمَعْرُوْفٍ শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক। তেমনিভাবে تَسْرِيْحٌ -এর সাথে اِحْسَانٌ শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায়, তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়; এহসান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসেবে কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিদায় করা উচিত।

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরিয়ত প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাত ছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কখনো বিয়ে হতে পারবে না।

একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন : এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোনো কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলি করে বা কোনো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলি বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ– সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরিয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রাসূল ﷺ-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েজও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ, তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

হুজুর ﷺ-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনার সংগ্রহ করেই একত্রিত করেছেন। সম্প্রতি জনাব মাওলানা আবূ জাহেদ সরফরাজ তাঁর 'উমদাতুল আসার' গ্রন্থে এ মাসআলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু' তিনটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

ইতঃপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কুরআনের দার্শনিক বর্ণনাসহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা : প্রথম আয়াতের বর্ণিত প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে, তখন স্বামীর দুটি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা।

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কুরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দু জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত

ও নিয়ম-কানুন বর্তমান রয়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরিয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশি বা আবেগের তাগিদে কোনো কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরিয়তের কিছু বিধান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী ﷺ–তাঁর হাদীসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেওয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এ জন্য শরিয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে দূর করে সুন্দর ও সুখি জীবন যাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে করতে হবে, স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে না। এজন্য আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

অর্থাৎ স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না।

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোনো অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা না করুক, অনেক সময় এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়। কুরআন হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। দুনিয়ার আইন-কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কুরআন শুধুমাত্র আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না; বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি, সে কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহর ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না : দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا খেলায় পরিণত করার একটি তাফসীর হচ্ছে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াতের যুগে কোনো কোনো লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাজিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাস মুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে মারদুভিয়াহ উদ্ধৃত করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, আর ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) থেকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ–

"তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। ১. বিবাহ, ২. তালাক ৩. রাজা'আত বা তালাক প্রত্যাহার।"

এ তিনটি বিষয়ে শরিয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের ইজাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরিয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোনো ওজররূপে গণ্য হবে না।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য বিয়েতে বাধা দেওয়া হারাম : দ্বিতীয় আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। প্রথম স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোনো কোনো পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমতো শরিয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে– إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ : তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শয়িতের নিয়মানুযায়ী রাজি হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজি না হয়, তবে কোনো এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজিও হয় আর তা শরিয়ত আইন মোতাবেক না হয়, যথা–বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোনো মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মহরের কম মহরে বিয়ে করতে চায়। যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে إِذَا تَرَاضَوْا বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে ইরশাদ হয়েছে– ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ অর্থাৎ, "এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।" এতেই ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের বিশ্বাস করে তাদের জন্য এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বুঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ' এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ। কেননা বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতি যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশঙ্কায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এই বাধার ফলে কোনো পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কুরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি : কুরআনে কারীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামতো বিয়ে করতে বাধা দেওয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনো ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَرِّحُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْرِيْح মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদেরকে মুক্তি দাও।

لَاتَتَّخِذُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা বানিও না।

يَعِظُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– সে উপদেশ দেয়।

اتَّقُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءَ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اعْلَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জেনে রাখ।

تَرَاضَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّرَاضِىْ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা পরস্পর সম্মত হবে।

يُوْعَظُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– উপদেশ দেওয়া হয়।

اَزْكٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّكٰوةُ মূলবর্ণ (ز ـ ك ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অধিক শুদ্ধ।

اَطْهَرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلطُّهُوْرُ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অধিক পবিত্র।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل ; আর اللّٰهُ শব্দটি اِنَّ এর اسم এবং بـاء হলো حرف جار ও كُلِّ شَيْئٍ টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق مقدم ও اسم অতঃপর اِنَّ এর خبر টি عليم টি شبه فعل অবশেষে, شبه فعل ও متعلق মিলে اِنَّ তার خبر হয়েছে, মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ টি مبتدأ আর لَا تَعْلَمُوْنَ হলো فعل এবং সর্বনামটি اَنْتُمْ ; فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

অনুবাদ (২৩৩) আর জননীগণ স্বীয় সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য দান করবে, এই নির্দিষ্ট সময় তারই জন্য, যে স্তন্য দানের মুদ্দত পূর্ণ করতে চায়, আর যার সন্তান তার দায়িত্বে স্তন্য দানকারিণীদের খোরপোষের ভার নিয়মানুযায়ী বর্তিবে, কাউকেও [কোনো] নির্দেশ দেওয়া হয় না কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী কোনো জননীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য এবং কোনো পিতাকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য, আর উক্ত নিয়মানুযায়ী [সন্তানের ভার] অর্পিত হবে ওয়ারিশদের উপর, অতঃপর যদি উভয়ে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে স্বীয় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে, তবে উভয়ের কোনো পাপ হবে না, আর যদি তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে [এতেও] তোমাদের কোনো পাপ হবে না, যখন সমর্পণ করবে, তাদেরকে যা কিছু দেওয়া স্থির করেছ, নিয়মানুযায়ী, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ খুব প্রত্যক্ষ করতেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৩) وَالْوَالِدَاتُ আর জননীগণ يُرْضِعْنَ স্তন্য দান করবে أَوْلَادَهُنَّ স্বীয় সন্তানদেরকে حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ পূর্ণ দুই বৎসরকাল لِمَنْ أَرَادَ এই নির্দিষ্ট সময় তারই জন্য أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ যে স্তন্য দানের মুদ্দত পূর্ণ করতে চায় وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ আর যার সন্তান তার দায়িত্বে বর্তিবে رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ স্তন্য দানকারিণীদের খোরপোষের ভার بِالْمَعْرُوفِ নিয়মানুযায়ী لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا কাউকেও [কোনো] নির্দেশ দেওয়া হয় না কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ কোনো জননীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় بِوَلَدِهَا তার সন্তানের জন্য وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ এবং কোনো পিতাকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ আর উক্ত নিয়মানুযায়ী [সন্তানের ভার] অর্পিত হবে ওয়ারিশদের উপর فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا অতঃপর যদি উভয়ে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ স্বীয় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তবে উভয়ের কোনো পাপ হবে না وَإِنْ أَرَدْتُمْ আর যদি তোমরা চাও أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ স্বীয় সন্তানদেরকে অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ হবে না إِذَا سَلَّمْتُمْ যখন সমর্পণ করবে إِذَا سَلَّمْتُمْ তাদেরকে যা কিছু দেওয়া স্থির করেছ بِالْمَعْرُوفِ নিয়মানুযায়ী وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখ যে أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ খুব প্রত্যক্ষ করছেন।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٢٣٤)

(২৩৪) আর যারা তোমাদের মধ্য হতে মৃত্যুবরণ করে এবং পত্নীগণকে রেখে যায়, উক্ত পত্নীগণ নিজেদেরকে বিরত রাখবে চার মাস ও দশ দিন, অনন্তর যখন তারা স্বীয় ইদ্দত পূর্ণ করবে। তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না ঐ সমস্ত কাজে যা উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্ব করবে যথানিয়মে এবং আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۵ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٣٥)

(২৩৫) আর তোমাদের জন্য গুনাহ হবে না এতে যে, উক্ত নারীদেরকে [বিবাহের] প্রস্তাব প্রদান সম্বন্ধে কোনো কথা ইঙ্গিত করে বল অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে, তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে কিন্তু তাদের সাথে [পরিষ্কার শব্দে] বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না, হ্যাঁ, কোনো কথা নিয়মানুযায়ী আলোচনা করতে পার, আর তোমরা [এখন] বিবাহ-বন্ধনের সঙ্কল্পও করো না যে পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যায়, আর দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি সুতরাং তাঁকে ভয় করতে থাক, আর বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৪) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ আর যারা তোমাদের মধ্য হতে মৃত্যুবরণ করে وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এবং পত্নীগণকে রেখে যায় يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ উক্ত পত্নীগণ নিজেদেরকে বিরত রাখবে اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا চার মাস ও দশ দিন فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ অনন্তর যখন তারা স্বীয় ইদ্দত পূর্ণ করবে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ ঐ সমস্ত কাজে যা উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্ব করবে بِالْمَعْرُوْفِ যথানিয়মে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ এবং আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

(২৩৫) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের জন্য গুনাহ হবে না فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ এতে যে কোনো কথা ইঙ্গিত করে বল مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ উক্ত নারীদেরকে [বিবাহের] প্রস্তাব প্রদান সম্বন্ধে اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ عَلِمَ اللّٰهُ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا কিন্তু তাদের সাথে [পরিষ্কার শব্দে] বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا হ্যাঁ, কোনো কথা নিয়মানুযায়ী আলোচনা করতে পার وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ আর তোমরা [এখন] বিবাহ-বন্ধনের সঙ্কল্পও করো না حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ যে পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যায় وَاعْلَمُوْٓا আর দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি فَاحْذَرُوْهُ সুতরাং তাঁকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوْٓا আর বিশ্বাস রেখ যে اَنَّ اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الخ -এর মর্মকথা : উল্লিখিত আয়াতটিতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের স্তন্যদানের সম্পর্কে বিধানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিশুকে স্তন্যদান করা শরিয়ত মায়ের উপর ওয়াজিব করেছে। কোনো মা যদি কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত শুধুমাত্র বৈষয়িক কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা শিশুর পিতার উপর অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করে দেয় তাহলে তা তার জন্য পাপ হবে। বিবাহ বহাল অবস্থায় স্ত্রী স্তন্য দানের জন্য স্বামীর নিকট হতে কোনো প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না। কেননা স্তন্যদান এটা স্ত্রীর দায়িত্ব। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্তন্যদায়িনী মা শিশুর পিতার নিকট স্তন্য দানের বিনিময়ে সামাজিক ন্যায়বিচার মতে যথাযথ স্তন্য মূল্যের অধিকারিণী হবেন।

শিশুর স্তন্য দানের সময়সীমা : (১) ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যপান বাচ্চার অধিকার। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো সঙ্গত নয়।

(২) ইমাম আবূ হানীফা (র.) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস তথা আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদানের সময় সীমার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত حَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন। তা ছাড়া তাঁর অভিমতের পক্ষে অনেক হাদীসও রয়েছে। তবে আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

قوله وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে বাচ্চার দুগ্ধপানের বিনিময় পিতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। অথচ সে পিতা-মাতার যৌন ফসল। এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ছিল যে, পিতা এ আদেশকে বোঝা মনে করবে। তাই কুরআনের ভাষ্যে وَالِدٌ শব্দের স্থলে مَوْلُوْدٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ শিশুটি যার পরিচয়ে ও যার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণকারী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিশুর লালন-পালন, পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব; যেহেতু শিশু পিতার বলেই অভিহিত হয়ে থাকে, পিতার বংশেই শিশুর বংশ পরিচয় হয়ে থাকে, সেহেতু শিশুর খরচের দায়িত্ব তার উপর কোনো বোঝা বলে মনে করা উচিত নয়।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর খরচ বা ভরণ-পোষণ স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী হবে, মর্যাদা অনুসারে নয়।

হেদায়া গ্রন্থাকার বলেন– যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তার এমন মানের খোরপোশ দিতে হবে যা দরিদ্রদের চেয়ে বেশি এবং ধনীদের চেয়ে কম। ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোশ নির্ধারণ করা হবে।

قوله لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ (মাকে স্তন্য দানে বাধ্য করার বৈধতা প্রসঙ্গে) : এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শিশুর পিতামাতা তাকে দুধ পান করানো নিয়ে কোনো ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না। মা যদি দুধপান করাতে অক্ষম হয়, আর পিতা মনে করে যে, শিশুটি তারও বটে। কাজেই মায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা চলবে কিন্তু তা সমীচীন নয়। অপারগ অবস্থায় তাকে দুধ পানে বাধ্য করা যাবে না। কিংবা পিতা দরিদ্র ব্যক্তি, পক্ষান্তরে মায়ের কোনো আর্থিক সমস্যা নেই, এতদসত্ত্বেও মা স্তন্যদানে এ বলে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পানের ব্যবস্থা করা হোক। মায়ের এমন অপারগতা প্রকাশের পর যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু কোনো দুগ্ধ বৈধ পশু বা অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করতে না চায়, তাহলে মাকে দুধ পানে বাধ্য করা যাবে।

قوله وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ -এর মর্মার্থ : যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তাহলে যে ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তথা অভিভাবক সে তার দুধ পানের দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ, সে দুধ মা ও ধাত্রীর ব্যয়ভার বহন করবে। আর যদি উত্তরাধিকারী একাধিক হয়, তাহলে প্রত্যেকে স্ব-স্ব মিরাশ অনুপাতে ব্যয়ভার বহন করবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এতিম শিশুর দুধ পানের ব্যয় বহনের দায়িত্ব উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করাতে এ কথা বুঝা যায় যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যয়ভার দুধ পান শেষ হওয়ার পরও তাদের উপরই বর্তাবে। কেননা দুধের কোনো বিশেষত্ব নেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে ভরণ-পোষণ।

قوله فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ **স্তন্য পান বন্ধকরণ সম্পর্কিত বিধান :** যদি শিশুর পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্থির করে যে, দুধ পানের সময়সীমার মধ্যেই স্তন্যদান বন্ধ করা হবে। চাই তা মায়ের কোনো সমস্যার কারণে বা বাচ্চার কোনো সমস্যার কারণে হোক, তাহলে তাতে কোনো গুনাহ নেই। পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের শর্তটি আরোপ করে বুঝানো হয়েছে যে, স্তন্যদান বন্ধের ব্যাপারটি সন্তানের মঙ্গল কামনার ভিত্তিতে হতে হবে। পরস্পর ঝগড়া বিবাদের কারণে বা ক্রোধের ফল হিসেবে শিশুর কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

قوله وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ الخ **ধাত্রী-মাতার দ্বারা স্তন্য পান করানোর হুকুম :** শিশুর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাকে মা ছাড়া অন্য মহিলার দুধ পান করানো যাবে। কিন্তু এই শর্তে যে, স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর যে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তা পুরাপুরিভাবে আদায় করতে হবে। আর যদি তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া না হয় তাহলে সে অপরাধের পাপ তার উপর অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তাবে।

এমনকি স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে পারিশ্রমিকের কথা দুধপান শুরু করার পূর্বেই পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে হবে, যাতে পরে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। আর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ ধাত্রীর পারিশ্রমিক তার হাতে পৌছে দিতে হবে। এতে কোনো প্রকার টালবাহানা করা চলবে না, যাতে স্তন্যদানে শিশুর কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব : এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্য দানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। –[মাযহারী]

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে : শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মতো হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরিব হলে গরিবের মতোই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন– যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশি এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

ফতহুল কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহর ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে– لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ

অর্থাৎ কোনো মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর কোনো পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।"

অর্থাৎ শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারগ হয় আর যদি পিতা মনে করে যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারগ অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ : পঞ্চম মাসআলা لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا এতে বুঝা যায় যে, মা যদি কোনো অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের বা কোনো জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত তিন হায়েয আর বিধবাদের ইদ্দত গর্ভবতী না হওয়ার ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন। আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু চার মাস দশ দিনের মধ্যে যদি তার সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে প্রসব করা দ্বারাই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। স্বামী মারা গেলে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীলোকদের সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ সজ্জা করা, সুরমা, তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওষুধ ব্যবহার করা, রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েজ নেই। বিবাহের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করাও জায়েজ নেই।

বিধবা গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, জমহুর আলিমদের নিকট গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। তবে হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ বিষয়ে ভিন্নমত পাওয়া যায়, তা হলো اَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ অর্থাৎ দু'ইদ্দতের মধ্যে যেটি দূরবর্তী সেটি ধর্তব্য। অর্থাৎ গর্ভ খালাসের পরেও যদি চার মাস ১০ দিন পূর্তির বাকি থাকে তবে অবশিষ্ট দিনগুলো পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। ইমাম শা'যবী, নাখায়ী, হাম্মাদ, হাসান গর্ভ খালাসের সাথে সাথে নিফাসের সময়টিও ইদ্দতের শামিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মহিলার উপর ইদ্দতের কারণ : শরিয়তের পক্ষ থেকে মহিলার উপর ইদ্দত প্রযোজ্য হওয়ার কয়েকটি কারণ ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। যেমন– (ক) জরায়ু পুরুষের বীর্যমুক্ত কিনা তা বুঝার জন্য। যেন একজনের বংশ অন্যজনের সাথে যুক্ত না হয়। (খ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ইবাদতের নিদর্শন উপস্থাপনের জন্য মহিলাদেরকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। (গ) স্বামী বিয়োগের উপর শোক প্রকাশ এবং এতদিন যে সে তার উপর করুণা করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। (ঘ) বিবাহ বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম একথা বুঝানোর জন্য। এ কাজটি ইচ্ছা করলেই সম্পাদন করা যায় না, আর করলেই তা মুহূর্তে বিচ্ছেদ করা যায় না। বিচ্ছেদ করে ফেললে সাথে সাথে আবার বিয়ে করা যায় না, দীর্ঘ দিন অপেক্ষায় থাকতে হয়। এটা কোনো খেল তামাশা নয়।

দাসীর ইদ্দত : মুক্ত-স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক হলো দাসীর ইদ্দত। অতএব তালাক হবে দু'টি আর ইদ্দত হবে দু' হায়েয বা দু' মাস পাঁচদিন। আল্লামা ইবনে সিরিনের মতে, দাসীর ইদ্দত স্বাধীনার মতোই হবে।

قوله وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا الخ -এর মর্মার্থ : স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনে যে সময় নির্ধারিত রয়েছে এটা ঐ বিধবাদের জন্য যাদের সাথে তাদের স্বামী নির্জনবাস করেছে। কিন্তু গর্ভবতী বিধবাদের সে ইদ্দত পালন করতে হবে না; বরং প্রসবের সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

قوله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ الخ -এর মর্মার্থ : تَعْرِيْض শব্দের আভিধানিক অর্থ পরোক্ষ সংকেত প্রদান করা, অস্পষ্ট কথা বলা। পারিভাষিক অর্থ হলো– এমন কথা বলা যা উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, ইদ্দতকালে মহিলার সাথে বিবাহ সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। (১) স্পষ্টভাবে মুখে প্রস্তাব করা হারাম। (২) মুখে সাংকেতিক বচনের মাধ্যমে প্রস্তাব করাতে দোষ নেই। (৩) ইদ্দতের মধ্যে অন্তরে অন্তরে বিবাহের সংকল্প পোষণ করা হারাম। (৪) ইদ্দতের পরে বিবাহ করবে বলে ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করাতে দোষ নেই।

ইদ্দতকালীন বিধান : স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী ইদ্দত কালের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ সজ্জা করা, সুরমা, তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওষুধ সেবন করা, অলংকার ব্যবহার করা এবং রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েজ নয়। বিবাহের জন্য প্রকাশ্য আলাচনা করাও দুরস্ত নয়। আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক যার তালাক প্রত্যাহার যোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামীর গৃহে ইদ্দত অতিক্রান্ত করার অবস্থায় দিনের বেলায় অতিপ্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও নিষিদ্ধ। –[মা'আরিফ]

اَلْكِتٰبُ শব্দের বিশ্লেষণ : اَلْكِتٰبُ শব্দের অর্থ হচ্ছে– লিখিত বিষয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকালকে বুঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

كِسْوَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন كُسًا وَ অর্থ– পোশাক-পরিচ্ছেদ।

تُكَلَّفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْلِيْفُ মূলবর্ণ (ك.ل.ف) জিনস صحيح অর্থ– তাকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়।

لَا تُضَارُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلضِّرَارُ মূলবর্ণ (ض.ر.ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।

تَسْتَرْضِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ر . ض . ع) মাসদার اَلْاِسْتِرْضَاعُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্তন্য পান করতে চাও।

سَلَّمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْلِيْمُ মূলবর্ণ (س . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অর্পণরেছ।

يُتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّيْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

يَذَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা রেখে যায়।

يَتَرَبَّصْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر . ب . ص) জিনস صحيح অর্থ– বিবাহ হতে বিরত থাকবে।

عَرَّضْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْرِيْضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ইঙ্গিতে বলেছ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ : এখানে اَلْوَالِدَاتُ হলো مبتدأ আর يُرْضِعْنَ হলো فعل এতে هُنَّ যমীর فاعل এবং اَوْلَادَهُنَّ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول به এবং حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ উভয়টি صفت ও موصوف মিলে مفعول فيه এখন فعل - فاعل - مفعول به ও مفعول فيه মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِعْلَمُوْا হলো فعل এতে انتم যমীর فاعل আর اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ শব্দটি اَنَّ এর اسم ; অতঃপর بِ টি حرف جار ও مَا টি اسم موصول এবং تَعْمَلُوْنَ হলো فعل এতে انتم হলো فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর اسم موصول ও صلة মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হচ্ছে بَصِيْرٌ শিবহে فعل এর সাথে অবশেষে شبه فعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে مفعول به ও فعل - فاعل মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ (٢٣٦)

অনুবাদ (২৩৬) তোমাদের প্রতি কোনো [মহরের] দায়িত্ব নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এরূপ অবস্থায় তালাক দাও যে, তাদেরকে স্পর্শও করনি আর তাদের জন্য কোনো মহরও ধার্য করনি, এবং তাদেরকে ফায়দা পৌছাও, সচ্ছল ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী এক বিশেষ রকমের ফায়দা [জামাজোড়া] পৌছানো যা যথারীতি সদাচারীদের উপর ওয়াজিব।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٧)

(২৩৭) আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মহরও নির্ধারিত করেছিলে, তাহলে তোমাদের নির্ধারিত মহরের অর্ধাংশ, হ্যাঁ যদি ঐ স্ত্রীগণ মাফ করে দেয় অথবা সেই ব্যক্তি [অর্থাৎ স্বামী স্বেচ্ছায় পূর্ণ মহর দিয়ে] অনুগ্রহ করে যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে, আর তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া পরহেজগারীর অধিক নিকটবর্তী এবং তোমরা পরস্পরে উদারতা প্রদর্শনে শৈথিল্য করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ্য করেন।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ (٢٣٨)

(২৩৮) তোমরা সংরক্ষণ কর সমস্ত নামাজের এবং মধ্যবর্তী নামাজের, আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৬) لَا جُنَاحَ তোমাদের প্রতি কোনো [মহরের] দায়িত্ব নেই اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এরূপ অবস্থায় তালাক দাও যে مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শও করনি اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً আর তাদের জন্য কোনো মহরও ধার্য করনি وَّمَتِّعُوْهُنَّ এবং তাদেরকে ফায়দা পৌছাও عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ সচ্ছল ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ এক বিশেষ রকমের ফায়দা [জামাজোড়া] পৌছানো حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ যা যথারীতি সদাচারীদের উপর ওয়াজিব।

(২৩৭) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً এবং তাদের জন্য কিছু মহরও নির্ধারিত করেছিলে فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ তাহলো তোমাদের নির্ধারিত মহরের অর্ধাংশ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ হ্যাঁ যদি ঐ স্ত্রীগণ মাফ করে দেয় اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অথবা সেই ব্যক্তি অনুগ্রহ করে যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى আর তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া পরহেজগারীর অধিক নিকটবর্তী وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ এবং তোমরা পরস্পরে উদারতা প্রদর্শনে শৈথিল্য করো না اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।

(২৩৮) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ তোমরা সংরক্ষণ কর সমস্ত নামাজের وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এবং মধ্যবর্তী নামাজের وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে قٰنِتِيْنَ বিনয়ী অবস্থায়।

(২৩৯) আর যদি তোমাদের [যথারীতি নামাজ পড়তে] আশঙ্কা হয় তবে [জমিনে] দাঁড়িয়ে অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও, তখন আল্লাহর স্মরণ সেরূপে কর যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন– যা তোমরা জানতে না।	فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (٢٣٩)
(২৪০) আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয় এবং পত্নীগণকে রেখে যায়, তারা যেন স্বীয় পত্নীদের জন্য অসিয়ত করে যায়, যেন সে এক বৎসর পর্যন্ত উপকৃত হয় এরূপে যে, তাদেরকে ঘর হতে বহিষ্কৃত করা না হয়। হ্যাঁ, যদি নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই, ঐ নিয়ামত সঙ্গত বিষয়ে যা তারা নিজেদের জন্য [সাব্যস্ত] করে; আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানময়।	وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٤٠)
(২৪১) আর সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে কিছু কিছু ভোগ্যবস্তু দেওয়া নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে– পরহেজগারদের প্রতি।	وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ (٢٤١)
(২৪২) এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, আশা, তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।	كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٢٤٢)

ع ٣١ ١٥

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৯) فَاِنْ خِفْتُمْ আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় فَرِجَالًا তবে দাঁড়িয়ে اَوْ رُكْبَانًا অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও فَاِذَآ اَمِنْتُمْ অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও فَاذْكُرُوا اللّٰهَ তখন আল্লাহর স্মরণ সেরূপে কর كَمَا عَلَّمَكُمْ যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন– مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ যা তোমরা জানতে না।

(২৪০) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয় وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এবং পত্নীগণকে রেখে যায় وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ তারা যেন স্বীয় পত্নীদের জন্য অসিয়ত করে যায় مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ যেন সে এক বৎসর পর্যন্ত উপকৃত হয় এরূপে যে غَيْرَ اِخْرَاجٍ তাদেরকে ঘর হতে বহিষ্কৃত করা না হয় فَاِنْ خَرَجْنَ হ্যাঁ, যদি নিজেরাই বের হয়ে যায় فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ঐ নিয়ামতসঙ্গত বিষয়ে যা তারা নিজেদের জন্য করে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানময়।

(২৪১) وَلِلْمُطَلَّقٰتِ আর সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ কিছু কিছু ভোগ্যবস্তু দেওয়া নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে– حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ পরহেজগারদের প্রতি।

(২৪২) كَذٰلِكَ এরূপে يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন اٰيٰتِهٖ তাঁর নিধানসমূহ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ আশা, তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩৬) قوله مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যখন পূর্বের আয়াতে তালাক প্রাপ্তা নারীদের প্রতি সাধ্য অনুযায়ী ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইহসান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল তালাক প্রাপ্তা নারীর প্রতি ইহসান করা মোস্তাহাব। অতএব না করলে তাতে কোনো গুনাহ হবে না এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩৮) قوله حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** অধিকাংশ সময় ব্যবসায়িক লেন-দেনের কারণে সাহাবায়ে কেরামের আছরের নামাজ বিলম্ব হয়ে যেত। এমনকি সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতো। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩৮) قوله وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমরা নামাজের মধ্যেও কথাবার্তা বলতাম। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এর দ্বারা আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো। –[তিরমিযী]

(২৪০) قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মুকাতেল বিন হাইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তায়েফ থেকে ছেলে মেয়ে পিতামাতা ও স্ত্রীসহ মদিনায় আগমন করেন এবং এখানে এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ কে জানানো হলে তিনি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার পিতামাতা ও সন্তানদের যথারীতি অংশ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে কিছু দিলেন না। তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর এক বছরের ব্যয়ভার বহন করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

বি. দ্র. এ নির্দেশ ছিল মিরাশের আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে। পরে যখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয় এবং স্ত্রীকেও স্বামীর বাড়ি ঘর ও অন্যান্য জিনিসে অংশ দেওয়া হয় তখন এ আয়াতটির নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। –[মা'আরেফুল কুরআন]

قوله لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি অবস্থার হুকুম এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

- ❖ প্রথমটি হচ্ছে– স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি এবং মোহরও ধার্য করা হয়নি।
- ❖ দ্বিতীয়টি হচ্ছে– মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়নি।
- ❖ তৃতীয়টি হচ্ছে– মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে।
- ❖ চতুর্থটি হচ্ছে– মোহর ধার্য করা হয়নি অথচ সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দু' প্রকারের আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে স্বামীর কর্তব্য নিজের পক্ষ হতে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া। ন্যূনপক্ষে তাকে (স্ত্রীকে) এক জোড়া কাপড় দিয়ে দিবে। এর কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য এ কথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। সামর্থ্যবান লোক যেন এ ব্যাপারে কার্পণ্য না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে এর নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়।

দ্বিতীয় অবস্থার হুকুম হচ্ছে যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিবাহের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয় তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার।

মোত্য়ার পরিমাণ : মোত্য়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে গোলাম প্রদান করা, এর চেয়ে কম হলো রৌপ্য প্রদান, এর চেয়ে কম হলো কাপড় প্রদান করা। যদি তালাকদাতা ধনী হয় তাহলে দাস বা অন্য সমপরিমাণ কিছু প্রদান করা। আর যদি তালাকদাতা গরিব হয়, তাহলে একটি জামা, একটি ওড়না ও একটি চাদর "মোতা" স্বরূপ দান করবে।

قوله عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ **-এর মর্মকথা :** ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বর্ণনা করেন, اَلْمُوْسِعِ বলতে ধনী লোককে বুঝায়, আর اَلْمُقْتِرِ বলতে দরিদ্র লোককে বুঝায়। আয়াতের অর্থ হলো, স্বামীর অবস্থা অনুপাতে স্ত্রীর খোরপোষ নির্ধারণ করা হবে। কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর খোরপোষের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এমনিভাবে مُتْعَةٌ নির্ধারণ করতে হবে, যাতে করে স্বামীর জন্য তা তার ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়; কিংবা তার স্ত্রী নির্যাতিত না হয়। অধিকন্তু মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

قوله مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ-এর ব্যাখ্যা : কেউ যদি স্ত্রী সহবাস না করে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তখন তার কর্তব্য হবে নিজের পক্ষ হতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপভোগ্য বস্তু দিয়ে দেওয়া। ন্যূনপক্ষে তাকে এক প্রস্ত কাপড় প্রদান করবে। কুরআন মাজীদ প্রকৃত পক্ষে এ জন্যই কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। যার ফলে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। **(১) হযরত ইমাম হাসান (র.) হতে বর্ণিত,** এরূপ এক ক্ষেত্রে তিনি বিশ হাজার দিরহামের উপঢৌকন প্রদানের ফয়সালা দিয়েছিলেন। **(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)** বলেন, ন্যূনতম পরিমাণ হলো এক প্রস্ত কাপড়। **(৩) হযরত কাযী শোরাইহ (র.)** পাঁচশত রৌপ্য মুদ্রা দেওয়ার কথা বলেছেন। **(৪) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)** বলেন, যদি সহায়তার প্রশ্নে উভয়ই মতবিরোধ করে তাহলে মহরে মিছালের অর্ধাংশ দিতে হবে। **(৫) হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.)** বলেন, কোনো নির্দিষ্ট জিনিস প্রদানে স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না।

قوله إِلَّآ أَنْ يَّعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَ الخ -এর ব্যাখ্যা : পুরুষের পূর্ণ মহর দেওয়াকে তালাক প্রদত্ত মহিলার অর্ধেক প্রাপ্য মোহরের বিবরণের পাশাপাশি হয়তো এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরব দেশের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে দেওয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর স্বামী ফেরত পেত। যদি সে বদান্যতার কারণে অর্ধেক ফেরত না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায় পড়ে। এরূপ ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। এই ক্ষমা তারই নিদর্শন, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে উত্তম ও পুণ্যের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

قوله الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -এর তাফসীর : অত্র আয়াতের তাফসীরে রাসূল ﷺ নিজে বর্ণনা করেন যে, বিবাহ বন্ধনের মালিক হলো স্বামী। এ হাদীসটি দারাকুতনীতে আমর ইবনে শো'আইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এটি হযরত আলী (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সমাধা হওয়ার পর বিবাহ ঠিক রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী।

قوله الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى সম্পর্কে তাফসীর কারকগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ১. হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তা দ্বারা ফজরের নামাজ বুঝানো হয়েছে। ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে মাগরিবের নামাজ। ৩. কতিপয় সাহাবীদে মতে জোহরের নামাজ। ৪. কারো কারো মতে ইশার নামাজ। ৫. কারো মতে ঈদের নামাজ অথবা জুমার নামাজ। ৬. জমহুর বসরীদের মতে আসরের নামাজ উদ্দেশ্যে। অধিকাংশ বিজ্ঞ সাহাবীদের ও তাবেয়ীদের নির্ভরযোগ্য মতেও আসরের নামাজকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আর এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

كَمَا عَلَّمَكُمْ -এর ইঙ্গিত : যেমনিভাবে তিনি তোমাদেরকে নামাজ আদায় করার জন্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ নামাজ সম্বন্ধে শরিয়তের যে বিধান দেওয়া হয়েছে। আর ভয়-ভীতিতেও নিরাপদ অবস্থায় যেমনিভাবে নামাজ পড়ার পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তোমরা নামাজ পড় এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। অথবা, যেভাবে আদায় করতে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় হয়, ঠিক সেভাবেই তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় কর।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ এর মর্মার্থ : যখন তোমাদের শত্রুর বা হিংস্র প্রাণীর ভয়ের আশঙ্কা থাকবে তখন হাটাচলা অবস্থায় বা আরোহী অবস্থায় নামাজ আদায় কর। আর শত্রুর ভয় থেকে নিরাপত্তা লাভ করার প্রেক্ষিতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় কর। নিরাপদ অবস্থায় নির্ধারিত নিয়মে নামাজ আদায় কর এবং আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ কর।

ভয়কালীন নামাজ আদায় : যুদ্ধ চলাকালীন শত্রুর আক্রমণে অথবা যে কোনো সময়ে মানুষ অথবা হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়-ভীতি বিদ্যমান অবস্থায় আদায়কৃত নামাজকে সালাতুল খাওফ বলে। নামাজের সময় হলে ইমাম মানুষকে দু'দলে ভাগ করবে। একদল শত্রুর সম্মুখে থাকবে ও দ্বিতীয় দল ইকতেদা করবে। এক রাকাত হলে প্রথম দল শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে আর দ্বিতীয় দল ইকতেদা করবে, ইমাম দ্বিতীয় রাকাত ও তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে; কিন্তু মুক্তাদীগণ সালাম না ফিরিয়ে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। প্রথম দল এসে বিনা কেরাতে একা একা এক রাকাত ও তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে কেরাত সহকারে এক রাকাত ও তাশাহ্হুদ পড়ে নিবে।

قوله قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ এর মর্মার্থ : قٰنِتِيْنَ শব্দটি قُنُوْتٌ হতে নির্গত। অর্থ আনুগতকারীগণ। এর মর্মার্থ সম্পর্কে মুফাসসিরীনের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন قٰنِتِيْنَ অর্থ– ذَاكِرِيْنَ ও دَاعِيْنَ অর্থাৎ জিকিরকারী ও দোয়াকারী।
২. হযরত কাতাদাহ (রা.) ও হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ– مُطِيْعِيْنَ তথা আনুগত্যকারীগণ।
৩. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন- এর অর্থ خَاشِعِيْنَ তথা বিনয়ীগণ।

৪. ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ– سَاكِتِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চুপ বা নীরবতা পালনকারীগণ।
৫. তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে, এর অর্থ– ذَلِيْلِيْنَ তথা অতি নম্র ব্যক্তিগণ।
৬. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, এর অর্থ– اَلطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوْعِ তথা বিনয়ের সাথে আনুগত্য করা।
৭. কারো মতে اَلْاِشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ অর্থাৎ ইবাদতে মশগুল থাকা। যেমন হাদীসে এসেছে– قِيْلَ اَيُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ

নামাজের সংখ্যা নির্ধারণ : সকল মুসলমানের ঐকমত্যে নামাজ পাঁজ ওয়াক্ত। উক্ত আয়াতটি এই কথার প্রতি পূর্ণ সমর্থন করে। কেননা اَلصَّلَوَاتُ শব্দটি বহুবচন, এর দ্বারা কমপক্ষে তিন ওয়াক্ত নামাজ বুঝায়। তারপর اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى নিয়ে হলো চার ওয়াক্ত। এখন চার ওয়াক্ত হতে মধ্যবর্তী নামাজ নির্ধারণ করা যায় না। অতএব বুঝা যায় যে, নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত। মধ্যবর্তী এক ওয়াক্ত এবং দুই পাশে দুই ওয়াক্ত। এ ছাড়াও আরো চারটি আয়াত রয়েছে। যেমন–

১. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ এখানে سُبْحَانَ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ দ্বারা মাগরিব ও ইশা وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ দ্বারা ফজর عَشِيًّا দ্বারা আসর এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ দ্বারা জোহরের নামাজ উদ্দেশ্য।
২. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ আয়াতের দ্বারা دُلُوْك দ্বারা زَوَالُ شَمْسٍ উদ্দেশ্য। এর দ্বারা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং দ্বারা فَجْرٌ উদ্দেশ্য।
৩. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا আয়াতের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে।
৪. اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা পাওয়া যায়।

নামাজের সংরক্ষণ দ্বারা উদ্দেশ্য : নামাজের সংরক্ষণ বলতে সকল শর্তসহ নামাজ আদায় করাকে বুঝায়। অর্থাৎ, শরীর, কাপড় ও নামাজের স্থান পবিত্র, শরীর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া, নামাজের সকল আরকান সংরক্ষণ করা। নামাজ নষ্ট করে দেয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সর্বোপরি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করাকে সংরক্ষণ বুঝায়। –[তাফসীরে কাবীর]

رِجَالًا **ও** رُكْبَانًا **দ্বারা উদ্দেশ্য :** رِجَالٌ শব্দটি رَاجِلٌ-এর বহুবচন। পদব্রজে চলমান ব্যক্তিকে رَاجِلٌ বলা হয়। আর رُكْبَانَ শব্দটি رَاكِبٌ এর বহুবচন। পায়ে না চলে ঘোড়া, উটা বা অন্য যে কোনো বাহনে আরোহণকারীকে رَاكِبٌ বলা হয়। অতএব আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তোমরা স্বাভাবিকাবস্থায় না হয়ে কোনো ভয়ের মুহূর্তে অবস্থান করলে পায়ে হেটে হোক, আরোহণাবস্থায় হোক নামাজ আদায় করবে। কোনো অবস্থাতেই নামাজ ত্যাগ করা যাবে না। এমনকি ইশারা করে হলেও নামাজ আদায় করতে হবে।

ভয়ের সময় রাকাতের সংখ্যা : ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং একদল আলেমের মতে, ভয়ের সময় দু' রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে। যেমন সফরে দু'রাকাত আদায় করা হয়।

হাসান ইবনে আবুল হাসান, কাতাদাহ প্রমুখের মতে, ইশারার মাধ্যমে এক রাকাত পড়বে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুকিমাবস্থায় চার সফরাবস্থায় দুই ও ভয়ের সময় এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন।

قوله وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে অন্যান্যদের মতো স্ত্রীদেরকেও মৃত স্বামীর অসয়িতের উপর নির্ভর করতে হতো। তৎকালীন বিধান অনুযায়ী বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ঘরে বাস করতে চাইলে এক বছর কাল পর্যন্ত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে হতো, কিন্তু স্ত্রী ইদ্দত চলাকালে স্বীয় প্রাপ্য হিস্যা মৃত স্বামীর ওয়ারিশদেরকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করে চলে যেতে পারত। তারপর মিরাশের আয়াত নাজিল হওয়ায় এ আয়াতের বিধান মানসুখ হয়ে যায়।

قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا .... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ জাহেলিয়াত আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন– পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মিরাশের বিধান নাজিল হয়নি এবং মিরাশের কোনো অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি; বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের অসিয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ এর তাফসীরে বুঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ–সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই অসিয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর

থেকে বের দেওয়া জায়েজ ছিল না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েজ ছিল। এখানে 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয়, তখন বাড়ি-ঘর এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেওয়া হয়েছে, কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকারী রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

قوله وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধুমাত্র দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেওয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মহর দেওয়া। বাকি রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মহর দিয়ে দেওয়া। আর যার মহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মহরে মিছাল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বুঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেওয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বুঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেওয়া ওয়াজিব। তালাকে রাজয়ীই হোক আর তালাকে-বায়েনাই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَتِّعُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা খরচ দাও।

الْمُوْسِعِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْسَاعُ মূলবর্ণ (و ـ س ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ– সম্পদশালী, ধনী ব্যক্তি।

الْمُقْتِرِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتَارُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্বচ্ছল ব্যক্তি, দরিদ্র।

يَعْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা মাফ করে দেয়।

لَاتَنْسَوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভুলো না।

قُوْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা দণ্ডায়মান হও।

يُتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মরে যায়।

الْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাকওয়া অর্জনকারীগণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى : এখানে حٰفِظُوْا হলো فعل এতে اَنْتُمْ যমীর فاعل আর عَلٰى হলো حرف جار ও الصَّلَوٰتِ হলো معطوف عليه এবং واو টি হচ্ছে حرف عطف অতঃপর الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى হলো موصوف ও صفت মিলে معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে مجرور তারপর جار ও مجرور মিলে متعلق ; সবশেষে فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ : এখানে قُوْمُوْا হলো فعل এতে اَنْتُمْ যমীর ذو الحال আর قٰنِتِيْنَ হলো حال এবার حال ও ذو الحال মিলে فاعل এবং لله শব্দটি جار ও مجرور মিলে متعلق, এবার فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হলো।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣)	অনুবাদ (২৪৩) তুমি কি ঐ সকল লোকের ঘটনা অবগত নও– যারা বের হয়ে পড়ছিল নিজেদের ঘর হতে আর তারা বহু সহস্রই ছিল, মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য, সুতরাং আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন, নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা অতি অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকরগুজারী করে না।
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)	(২৪৪) আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)	(২৪৫) [এমন ব্যক্তি] কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দিবে উত্তম করজ দেওয়া, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন বহুগুণে, আর আল্লাহ তা'আলা কমান এবং বাড়ান, আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى ۘ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ	(২৪৬) মূসা পরবর্তী একদল বনী ইসরাঈলের কাহিনী তুমি কি জান না? যখন তারা নিজেদের এক নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করুন যেন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি,

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪৩) أَلَمْ تَرَ তুমি কি ঐ সকল লোকের ঘটনা অবগত নও– إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا যারা বের হয়ে পড়ছিল مِنْ دِيَارِهِمْ নিজেদের ঘর হতে وَهُمْ أُلُوفٌ আর তারা বহু সহস্রই ছিল حَذَرَ الْمَوْتِ মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন مُوتُوا মরে যাও ثُمَّ أَحْيَاهُمْ অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন إِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা لَذُو فَضْلٍ অতি অনুগ্রহশীল عَلَى النَّاسِ মানুষের প্রতি وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ কিন্তু অধিকাংশ লোক لَا يَشْكُرُونَ শোকরগুজারী করে না।

(২৪৪) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ়ভাবে একথা জেনে রাখ যে أَنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ سَمِيعٌ খুব শ্রবণকারী, عَلِيمٌ মহাজ্ঞানী।

(২৪৫) مَنْ ذَا কে আছে, الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ যে আল্লাহকে করজ দিবে قَرْضًا حَسَنًا উত্তম করজ দেওয়া فَيُضٰعِفَهُ لَهُ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন أَضْعَافًا كَثِيرَةً বহুগুণে وَاللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা يَقْبِضُ কমান وَيَبْصُطُ এবং বাড়ান وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(২৪৬) أَلَمْ تَرَ তুমি কি জান না? إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ একদল বনী ইসরাঈলের কাহিনী مِنْ بَعْدِ مُوسٰى মূসা পরবর্তী إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ যখন তারা নিজেদের এক নবীকে বলেছিল যে ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করুন نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ যেন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি قَالَ সেই পয়গম্বর বললেন هَلْ عَسَيْتُمْ এরূপ সম্ভাবনা আছে কি যে

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوْا ۖ قَالُوْا وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٢٤٦)

وقف لازم

অনুবাদ : সেই পয়গম্বর বললেন, এরূপ সম্ভাবনা আছে কি যে, যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমাদের এমন কি কারণ হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করব না, অথচ আমরা আমাদের বাড়ি-ঘর হতে এবং সন্তানদের হতেও বহিষ্কৃত হয়েছি, অনন্তর যখন তাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হলো তখন তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হলো, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে ভালোরূপেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوْٓا أَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٤٧)

(২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল, আমাদের উপর তার রাজত্ব করার অধিকার কিরূপে থাকতে পারে? অথচ তার তুলনায় আমরাই রাজত্ব করার অধিক যোগ্য, তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতা প্রদান করা হয়নি, পয়গম্বর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোকাবিলায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, আর আধিক্য প্রদান করেছেন, তাকে জ্ঞানে এবং দেহাবয়বে, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আর আল্লাহ প্রশস্ততা প্রদানকারী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয় أَلَّا تُقَاتِلُوْا তোমরা যুদ্ধ করবে না? قَالُوْا তারা বলল وَمَا لَنَا আমাদের এমন কি কারণ হতে পারে যে أَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করব না وَقَدْ أُخْرِجْنَا অথচ আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি مِنْ دِيَارِنَا আমাদের বাড়ি-ঘর হতে وَأَبْنَآئِنَا এবং সন্তানদের হতেও فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ অনন্তর যখন তাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হলো تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ তখন তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হলো وَاللهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে ভালোরূপেই জানেন।

(২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিযুক্ত করেছেন لَكُمْ তোমাদের জন্য طَالُوْتَ তালূতকে مَلِكًا বাদশাহ قَالُوْا তারা বলতে লাগল أَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا আমাদের উপর তার রাজত্ব করার অধিকার কিরূপে থাকতে পারে? وَنَحْنُ أَحَقُّ অথচ আমরাই অধিক যোগ্য بِالْمُلْكِ রাজত্ব করার مِنْهُ তার তুলনায় وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতা প্রদান করা হয়নি قَالَ পয়গম্বর বললেন إِنَّ اللهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোকাবিলায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন وَزَادَهٗ আর আধিক্য প্রদান করেছেন بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ তাকে জ্ঞানে এবং দেহাবয়বে وَاللهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততা প্রদানকারী, মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৪৩) قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বনী ইসরাঈলদের এক সম্প্রদায় আরুয়াত অথবা দাউরাদান নামক স্থানে বসবাস করত। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তারা ভীত হয়ে সকলে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে এ কথা অবগত করানোর জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না, তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশ্তা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন বিকট শব্দ করলেন যে, সকলে একসাথে মৃত্যুবরণ করল। তাদের মধ্যে একটি লোকও জীবিত ছিল না। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের কাফন-দাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, তাই তাদের চারিদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধ কূপের মতো করে দেওয়া হলো। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃত দেহগুলো পঁচে গলে গেল, আর হার গোড়গুলো তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলদের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাবার পথে সে বন্ধ স্থানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়গুলো থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ তা'আলা! আপনি তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করে দিন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। আর সকলকে পুনর্জীবিত করে দিলেন। উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –মা'আরেফুল কুরআন

(২৪৫) قوله مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একদা আবূ দাহ্দাহ্ (রা.) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'টি বাগান আছে আমি এর একটি দান করলে ঐ জাতীয় বাগান বেহেশ্তে পাব কি এবং আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও আমার সাথে থাকবে কি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বাগানের দ্বারে গিয়ে তার স্ত্রীকে এ সুসংবাদটি জানাল, তাতে সে আনন্দে বলে উঠল "আপনার কৃত বস্তুতে আল্লাহ বরকত দান করুন"। অতঃপর আবূ দাহ্দাহ্ (রা.) উত্তম বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন। তার এ দানের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জিহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মাউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোনো এক শহরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু' ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই এক সাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইল না; পাশ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাই তাদেরকে চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধ কূপের মতো করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সে বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন–

অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহর নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করল। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর] অনেক জড়বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও আল্লাহর অনুগত ও ফরমাঁবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী। কুরআনে কারীম اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন।

মোটকথা, একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বলো, 'ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সুসজ্জিত হও।'

সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ করা হলো। হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করল। আর সবাই বলতে লাগল سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ "তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই।"

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবিকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এর বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদর পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মূহুর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মূহুর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কুরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কুরআন মাজীদ ইরশাদ করেছে– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ অর্থাৎ আপনি কি সেসব লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল।"

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুজুর ﷺ-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুজুর ﷺ-এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে اَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য কি? মুফাসসিরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে اَلَمْ تَرَ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ ঘটনা হুজুর ﷺ-এর যুগের বহু পূর্বেকার যা হুজুরে পাক ﷺ-এর দেখার কথা কল্পনা ও করা যায় না। সে সব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন । এসব ক্ষেত্রে اَلَمْ تَرَ দ্বারা اَلَمْ تَعْلَمْ [আপনি কি জানেন না?] বুঝানো হয়। তবুও اَلَمْ تَرَ শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইঙ্গিত করা। বুঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসদ্ধি এবং বহুল আলোচিত যেন এখনো ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। اَلَمْ تَرَ-এর পরে اِلٰى শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত বুঝায়। অতঃপর কুরআন কারীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وَهُمْ اُلُوْفٌ অর্থাৎ সংখ্যা তারা ছিল হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বুঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে– فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন, "তোমরা মরে যাও।" আল্লাহর এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে, বা পরোক্ষভাবে কোনো ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে।

অতঃপর বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত যা বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে– وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার শত সহস্র দয়া ও করুণার নির্দশন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোনো তাদবীর কার্যর হতে পারে না। জিহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যা কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। দ্বিতীয়তঃ কোনোখানে কোনো মহামারী কিংবা কোনো মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া বৈধও নয়। রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আজাব নাজিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোনো শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি কোনো এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।'

প্লেগ সম্পর্কে মহানবীর উক্তির দর্শন : এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনোখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়। এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার পর একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল, এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেত না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোনো ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমতো ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাজত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহর দেওয়া তাকদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রুষা কিংবা মারা গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাসজীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা।

তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া প্রবেশ করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছিড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়ে থাকে তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

ইমাম বুখারী (র.) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভিতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্যসহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মতো ছওয়াব পাবে। হুজুর ﷺ-এর বাণী– 'প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ' এর ব্যাখ্যাও তাই।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কুরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এটা একান্তই আল্লাহর কুদরত যে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহর অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) যার সমগ্র ইসলামি জীবনই জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোনো জিহাদে শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মতো বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।'

قوله يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে করজ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, সেভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দিবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে। আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন

১. কোনো একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদকা করার সমতুল্য।"

২. ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে–إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন- আবূ দাহদাহ (রা.) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) বলতে লাগলেন– 'আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহকে ঋণ দিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। হযরত আবূ দারদাহ (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম– যাতে খেজুরের ছয় শ' ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন এর বদলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দান করবেন।

হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন : খেজুরের পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবূ দাহদাহর জন্য তৈরি হয়েছে।

৩. ঋণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোনো শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার [ঋণের] হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।'

তবে যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মরে যাও।

اَحْيَاهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَا মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে জীবিত করল।

قَاتِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْقِتَالُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জিহাদ কর।

اِعْلَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জান।

قَدْاُخْرِجْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى قريب مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– আমাদেরকে বের করা হয়েছে।

دِيَارِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন دَارٌ অর্থ– ঘরসমূহ।

اَبْنَاءٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اِبْنٌ অর্থ– ছেলেরা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা বিমুখ হলো।

اِصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكرغائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি নির্বাচন করেছেন।

يُؤْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তিনি দান করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ الخ : এখানে أ টি استفهامية আর لَمْ تَرَ হলো فعل এবং اِلٰى হলো حرف جار ও اَلَّذِيْنَ হলো اسم موصول আর خَرَجُوْا হলো فعل এতে هُمْ যমীর হলো ذو الحال আর واو টি حالية এবং هُمْ টি مبتدأ আর اُلُوْفٌ তার خبر এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে حال অতঃপর ذو الحال ও حال মিলে فاعل হয়েছে। من টি حرف جار ও دِيَارِهِمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। حذر الموت উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول له হয়েছে। এখন فعل ـ فاعل ـ مفعول له ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার موصول ও صلة মিলে مجرور হলো হরফে জারের اِلٰى। জার ও مجرور মিলে متعلق হলো لَمْ تَرَ ফে'ল-এর। অবশেষে لَمْ تَرَ ফে'ল তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : এখানে واو টি حرف عطف হয়েছে, اِلَيْهِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق مقدم আর تُرْجَعُوْنَ ফে'লে مجهول এতে اَنْتُمْ যমীর نائب فاعل এখন فعل مجهول ـ نائب فاعل ও متعلق مقدم মিলে جملة فعلية হলো।

قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى : এখানে أ টি حرف استفهامية এবং لَمْ تَرَ হলো فعل আর اَنْتَ যমীর فاعل এবং اِلَى الْمَلَاِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে প্রথম متعلق তারপর من টি حرف جار এবং بَنِىْ ও اِسْرَآئِيْلَ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে দ্বিতীয় متعلق আর من হলো حرف جار এবং بعد موسى উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে তৃতীয় متعلق অতঃপর فعل ـ فاعل ও সকল متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٤٨)

অনুবাদ (২৪৮) আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আসবে, যাতে সান্ত্বনার বস্তু রয়েছে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আর কতক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে যা মূসা ও হারূন (আ.) পরিত্যাগ করে গেছেন, উক্ত সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করে আনবে, তাতে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٢٤٩)

(২৪৯) অনন্তর যখন তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদী দ্বারা, সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি তা মুখেও না নেয় সে আমার দলভুক্ত, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তে এক অঞ্জলি পানি পান করে [তবে এতটুকু অনুমতি আছে], অতঃপর সকলেই তা হতে পান করতে লাগল, তাদের মধ্যকার অল্পকয়েকজন ব্যতীত, সুতরাং যখন তালূত এবং তাঁর সঙ্গী-মুমিনগণ নদী অতিক্রম করে গেলেন, তারা বলতে লাগল– আজ তো আমাদের মধ্যে জালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না, এরূপ লোক যাদের এই ধারণা ছিল যে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, বলতে লাগল, কত কত ক্ষুদ্র দল বৃহত্তম দলের উপর আল্লাহর হুকুমে জয় লাভ করেছে, বস্তুত আল্লাহ অটল সঙ্কল্পকারীদের সহায়তা করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪৮) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আসবে فِيْهِ سَكِيْنَةٌ যাতে সান্ত্বনার বস্তু রয়েছে مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَبَقِيَّةٌ আর কতক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ যা মূসা ও হারূন পরিত্যাগ করে গেছেন تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ উক্ত সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করে আনবে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ তাতে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

(২৪৯) فَلَمَّا فَصَلَ অনন্তর যখন যাত্রা করলেন طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে قَالَ তখন তিনি বললেন اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন بِنَهَرٍ একটি নদী দ্বারা فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে পানি পান করবে فَلَيْسَ مِنِّيْ সে আমার দলভুক্ত নয় وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ আর যে ব্যক্তি তা মুখেও না নেয় فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ সে আমার দলভুক্ত اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তে এক অঞ্জলি পানি পান করে فَشَرِبُوْا مِنْهُ অতঃপর সকলেই তা হতে পান করতে লাগল اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ তাদের মধ্যকার অল্পকয়েকজন ব্যতীত فَلَمَّا جَاوَزَهٗ সুতরাং যখন নদী অতিক্রম করে গেলেন هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ তালূত এবং তাঁর সঙ্গী-মুমিনগণ। قَالُوْا তারা বলতে লাগল– لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ আজ তো আমাদের মধ্যে ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ জালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ এরূপ লোক যাদের এই ধারণা ছিল যে, اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ তারা অবশ্যই আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, বলতে লাগল كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ কত কত ক্ষুদ্র দল غَلَبَتْ জয় লাভ করেছে فِئَةً كَثِيْرَةًۢ বৃহত্তম দলের উপর بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ বস্তুত আল্লাহ অটল সঙ্কল্পকারীদের সহায়তা করেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٢٥٠)

অনুবাদ : (২৫০) আর যখন সমরক্ষেত্রে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন বলতে লাগল, হে আমাদের প্রভু! আমাদের অন্তরে দৃঢ়তা নাজিল করুন আর আমাদের পদ দৃঢ় রাখুন, আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٢٥١)

(২৫১) অনন্তর তালূতের বাহিনী জালূতের দলকে আল্লাহর হুকুমে পরাস্ত করে দিল। আর দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন, আর তাকে আল্লাহ পাক রাজত্ব ও জ্ঞান দান করলেন উপরন্তু আরো যা কিছু আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন, আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রদমিত না করতে থাকতেন, তবে বিশ্ব অশান্তিপূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ খুবই অনুগ্রহশীল বিশ্ববাসীর প্রতি।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٢٥٢)

(২৫২) এই সমুদয় আল্লাহর আয়াত যা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে, আর নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫০) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ আর যখন সমরক্ষেত্রে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো। قَالُوْا তখন বলতে লাগল رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে আমাদের প্রভু! আমাদের অন্তরে দৃঢ়তা নাজিল করুন وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا আর আমাদের পদ দৃঢ় রাখুন وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

(২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ অনন্তর তালূতের বাহিনী জালূতের দলকে আল্লাহর হুকুমে পরাস্ত করে দিল। وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ আর দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন وَاٰتٰهُ اللّٰهُ আর তাকে আল্লাহ পাক দান করলেন الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ রাজত্ব ও জ্ঞান وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ উপরন্তু আরো যা কিছু আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ আর যদি আল্লাহ তা'আলা প্রদমিত না করতে থাকতেন النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ মানব সমাজের এক দলকে অন্য দল দ্বারা لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ তবে বিশ্ব অশান্তিপূর্ণ হয়ে যেত وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ কিন্তু আল্লাহ খুবই অনুগ্রহশীল عَلَى الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীর প্রতি।

(২৫২) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এই সমুদয় আল্লাহর আয়াত نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ যা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আর নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনী ইসরাঈলের নবীর পরিচয় : হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ হতে বনী ইসরাঈলগণ "তাবূতে সাকিনা" (শান্তির সিন্দুক) টি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যার কল্যাণে বা বরকতে তারা বিজয় লাভ করত। কালক্রমে তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হতে এ বরকতটি ছিনিয়ে নেন। নবুয়ত প্রাপ্তি তাদের মধ্য হতে সমাপ্তি ঘটে। তাদের বংশে শুধুমাত্র একজন গর্ভবতী মহিলা জীবিত ছিল। তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় শামাবীল বা সামাউন। নবুয়তের বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়তের দায়িত্ব পালন কালে তাঁর কওম তাঁর নিকট একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন জানান। যার নেতৃত্বে তারা জিহাদ করবে। তিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশে তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করলেন।

তালুতের পরিচয় : তালূত বিনইয়ামীন গোত্রের লোক। বাইবেলে তাঁর নাম বলা হয়েছে "শোল।" তিনি সাধারণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি তাঁর পিতার হারানো গাধার খোঁজে বের হয়েছিলেন। যেতে যেতে তিনি হযরত শামাবীল (আ.)-এর বাসস্থানের নিকট পৌছলে তিনি (শামাবীল) আল্লাহর নির্দেশে তালূতকে বাড়িতে নিয়ে যান, তাঁর মাথায় তেল দেন এবং তাকে চুম্বন করেন। আর বনী ইসরাঈলদের একটি সাধারণ সভা ডেকে এ যুবককে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। বনী ইসরাঈলগণ প্রথমে তাঁর রাজত্ব স্বীকার করেনি। কারণ তিনি কোনো রাজ বংশ বা ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেননি। অবশ্য পরে নবীর আদেশক্রমে তাঁর রাজা সুলভ নিদর্শন দেখে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

قوله اَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : তালূত বনী ইসরাঈলদের বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার উত্তম নিদর্শন হচ্ছে যে, তাদের হারানো "তাবূতে সাকীনাহ" (শান্তির সিন্দুক) খানা ফিরে পাবে। বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর ঐতিহ্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে, তাদের অন্যায়-অত্যাচার চরম সীমায় পৌছলে এ সিন্দুকটি জালূত এর হস্তগত হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বনী ইসরাঈলদেরকে এ সিন্দুকটি ফিরিয়ে দিলেন। ঘটনার বিবরণ এই, কাফেররা সিন্দুকটি যেখানেই রাখত সে এলাকাতেই ভীষণ বিপদ আপদ উপস্থিত হতো। অবশেষে বাধ্য হয়ে জালূত সিন্দুকটিকে একটি গরুর গাড়ী দিয়ে নিজ এলাকা হতে পাঠিয়ে দিয়ে নিস্তার পেল। ফেরেশতাগণ গাড়ি খানিকে বনী ইসরাঈলদের নিকট পৌছে দিলেন। তাতে বনী ইসরাঈলগণ আনন্দিত হয়ে তালূতকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে নিল।

তাবূতে সাকীনার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য : কারো মতে এটি একটি সোনার থালা ছিল, যাতে নবীদের অন্তঃকরণ ধৌত করা হতো। এটি হযরত মূসা (আ.) প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাতে তিনি তাওরাতের তখতীগুলো রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর মুখ ছিল, রুহও ছিল এবং দু'টি মাথা ও লেজ ছিল। যখন তারা তার নিকট কোনো সাহায্য চাইতো, তখন তা পেত, ফলে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত। তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে এর মাধ্যমে মীমাংসা করে নিত। আবার কারো মতে তা ছিল একটি সিন্দুক।

হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের যে সংকলন করেছিলেন, তার মূল গ্রন্থও তাতে সংরক্ষিত ছিল। একটি বোতলে কিছুটা "মান্না" ও ছিল। যেন পরবর্তী বংশধরগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি মরু ভূমিতে প্রদত্ত আল্লাহর এ অপূর্ব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারে। হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠিও তাতে সংরক্ষিত ছিল।

قوله سَكِيْنَةٌ الخ -এর উদ্দেশ্য : سَكِيْنَةٌ শব্দের উদ্দেশ্য বর্ণনায় মুফাস্‌সিরগণ মতানৈক্য করেছেন। (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীনা হলো জান্নাতী পেয়ালা যাতে নবীদের অন্তর ধোয়া হয়েছিল। (২) হযরত আলী (রা.) বলেন, এটি একটি প্রবল বাতাস। (৩) কেউ কেউ বলেন, سَكِيْنَةٌ হলো বনী ইসরাঈলরা যখন তালূতের ব্যাপারে মতভেদ করছিল এবং এ মতভেদের পর যে নিষ্কৃতি পেয়েছিল তাই سَكِيْنَةٌ (৪) কারো কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বয়ং তাবূত যা তাদের প্রশান্তির কারণ হবে এবং যুদ্ধের মাঠে তাবূত সামনে থাকলে তারা মানসিক প্রশান্তির কারণে যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করবে না। (৫) ওহাব ইবনে মুনাববিহ (র.) বলেন, سَكِيْنَةٌ আল্লাহর পক্ষ হতে একটি রুহ যা কথা বলত এবং সঠিক বস্তুটি উপস্থাপন করত। আর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে আওয়াজ করে লোকদের উৎসাহিত করত।

قوله وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى الخ -এর ব্যাখ্যা : بَقِيَّةٌ শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যামান। بَقِيَّةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ অবশিষ্টাংশ। অর্থাৎ তার মধ্যে মূসা ও হারূন (আ.)-এর রেখে যাওয়া স্মৃতির অবশিষ্টাংশ ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) এ প্রসঙ্গে তাঁর কিতাবে অনেকের অভিমত উল্লেখ করেছেন।

(১) হযরত ইকরামা (র.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা তাওরাত কিতাব বুঝানো হয়েছে যা মূসা ও হারূন (আ.) বনী ইসরাঈলদের জন্য অনুকরণীয় বস্তু হিসেবে রেখে যান। (২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ.)-এর লাঠি উদ্দেশ্য, যা তাবূতে রক্ষিত ছিল। (৩) হযরত আবূ সালেহ (র.) বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, কাপড় এবং হারূন (আ.)-এর কাপড়, পাগড়ি ও তাওরাত উদ্দেশ্য।

قوله فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ الخ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : তালূত যখন জালূতের বিরুদ্ধে যাত্রার জন্য যুবক লোকদের প্রতি আহ্বান জানাল, তখন সখের বসে আশি হাজার সৈন্য তালূতের সঙ্গী হলো। আল্লাহর পক্ষ হতে তালূত তাদেরকে পরীক্ষা করলেন। আর তা হচ্ছে– পথিমধ্যে একটি নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, যারা এ নদীর পানি এক অঞ্জলী ব্যতীত অধিক পরিমাণে পান করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা মোটেই পান করবে না অথবা হাতের এক অঞ্জলী মাত্র পান করবে তারা আমার লোক তাতে সন্দেহ নেই। নদী পার হওয়ার সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। সুতরাং সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই পেট ভরে পানি পান করে নিল, তবে তাদের পিপাসা আরও বেড়ে গেল।

قوله قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ الخ -এর মর্মার্থ : মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণে বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদের দূরে সরানোই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য আল্লাহ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন যা ছিল অত্যন্ত উপযোগী। কেননা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত প্রখর দিনে প্রবল পিপাসায় প্রচুর পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান না করা বিরাট দৃঢ়তার পরিচায়ক। উল্লেখ্য, কুরআনে যে নদীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো জর্দান নদী।

طَالُوْتْ -এর নামকরণ : طَالُوْتَ শব্দটি طُوْل ধাতু থেকে গঠিত। طَالُوْتُ উচ্চারণে اسم فاعل مبالغة-এর সীগাহ, যার অর্থ–অধিক লম্বা। তিনি যেহেতু বনী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে সুঠামদেহী ও অধিকতর লম্বা ছিলেন, এ জন্যই তাঁকে তালূত নামকরণ করা হয়েছে। বাস্তবে এ শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ। অতএব, طَوْلٌ শব্দ থেকে এর আরবিকরণ পণ্ডশ্রম মাত্র। তালূত মোট চল্লিশ বছর বনী ইসরাঈলের রাজা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি একধারে নবী ও বাদশাহ ছিলেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তিনি রাজা ছিলেন। তবে শামাবীল নবীর ওহী দ্বারা তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতেন।

قوله قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ الخ -এর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা : রূহুল মা'আনীতে ইবনে আবূ হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াতের উদ্ধৃতিতে ঘটনাটির যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, হতে বুঝা যায় যে, এতে তিন প্রকার লোক ছিল। যেমন–(১) একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ততে পারেনি। (২) দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই; কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে শত্রুর মোকাবিলায় বিজয় লাভে আস্থাহীন ছিল। (৩) তৃতীয় দল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যা লঘিষ্টতার জন্য কোনো চিন্তা করেননি।

তালূতের সৈন্য সংখ্যা : ইমাম সুদ্দির মতে তালূতের প্রাথমিক সৈন্য সংখ্যা আশি হাজার ছিল। বুখারী শরীফে বদর যুদ্ধের বর্ণনা অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বদরে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালূতের সৈন্য বাহিনীর সমান ছিল। তাতে বুঝা যায় যে, যারা নদী অতিক্রম করে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। কেউ কেউ ৩৬০ বলে বর্ণনা করেছেন।

قوله وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যা : তালূত যুদ্ধের জন্য ডাক দেওয়াতে ঝোঁকের বশে অনেকেই সেনাদলে যোগদান করে, কিন্তু হীনমনোবল ব্যক্তিদের কারণে দৃঢ়মনা যোদ্ধাদের মনেও তাদের সাথে সাথে দুর্বলতা এসে যেতে পারে, সেহেতু হীনমনোবল ব্যক্তিদেরকে তালূতের সেনাবাহিনী হতে বের করার উদ্দেশ্যেই একটি নদী দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অত্যন্ত প্রখর দিনে প্রবল পিপাসায় প্রচুর পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান না করা বিরাট ধৈর্যশীল হওয়ার পরিচায়ক, সুতরাং এ মহা পরীক্ষায় যারা ধৈর্য সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সঙ্গেই আল্লাহ রয়েছেন এবং তাঁদেরকেই বিজয় দিয়েছেন।

তালূত ও জালূতের ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের এগার শত বৎসর পূর্বে আমালিকা নামক স্থানে বর্তমান সিরিয়া রাজ্যে হযরত শামুয়েল (আ.)-এর জমানায় জালূত নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে তাদের থেকে তাদের পুত্র কন্যা ও সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেয়। তারা হযরত শামুয়েল (আ.)-এর নিকট জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আহবান জানায়। হযরত শামুয়েল (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তালূত নামক জনৈক ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেন। তালূত সম্পদশালী নয় এবং সাধারণ পরিবারের লোক বিধায় লোকেরা তাঁকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা আপত্তি করে যে, রাজত্বের ব্যাপারে তালূত অপেক্ষা আমরাই বেশি হকদার। হযরত শামুয়েল (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে দৈহিক শক্তি ও রাজনৈতিক জ্ঞান দান করেছেন। তা ছাড়া তালূতের মানোনয়নের নিদর্শন হচ্ছে যে, তোমাদের হারানো সম্পদ "তাবূতে সাকিনা" ফেরেশ্তা কর্তৃক পুনরায় তোমাদের হস্তগত হবে। এ শুভ সংবাদ পেয়ে সকলেই তালূতকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিল। অবশেষে তালূত আশি হাজার সৈন্য নিয়ে জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সৈন্যরা পানি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পানি প্রার্থনা করলে তালূত বললেন, তোমাদের যাত্রা পথে সামনে একটি নদী পড়বে। এ নদীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান এবং ধৈর্য পরীক্ষা করবেন। আর তা হচ্ছে নদী অতিক্রমকালে প্রচণ্ড তৃষ্ণায়ও তোমরা নদী হতে পানি পান করতে পারবে না। তবে এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পান করতে পারবে। তার বেশি নয়। যে এক অঞ্জলীর

অধিক পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। তাদের মধ্য হতে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাকা ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না। উত্তীর্ণের সংখ্যা ছিল তালূতসহ ৩১৩ জন। বাকি সবাই পেট পূর্ণ করে পানি পান করার ফলে নদীর তীরে পড়ে রইল। জালূতের তিন লক্ষ সৈন্য দেখে অল্প সংখ্যক দুর্বল ঈমানের লোকেরা ঘাবড়ে গেল এবং যুদ্ধ করার অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু মজবুত ঈমানের লোকেরা যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা বলল– অনেক ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে। জিহাদে জয়লাভ করার মূল বস্তু হচ্ছে ঈমান। সুতরাং তারা আমালিকায় পৌছে যুদ্ধের সম্মুখীন হলো এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাল যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সুদৃঢ় থাকার শক্তি দিন এবং ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। মুনাজাত শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধে জালূত হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে নিহত হয় এবং বনী ইসরাঈলগণ জয়লাভ করে।

হযরত দাউদ (আ.)-এর পরিচয় : বনী ইসরাঈলদের নবী হযরত শামুয়েল (আ.) ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে জালূতের মৃত্যু নির্দিষ্ট। তাই নবী হযরত দাউদ (আ.)-কে খোঁজ করে তাঁর পিতার নিকট হতে অনুমতি নিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তখন তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তিনটি পাথর হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে কথা বলে যে, اِنَّكَ بِنَا تَقْتُلُ جَالُوْتَ অর্থাৎ আপনি আমাদের দ্বারা জালূতকে হত্যা করতে পারবেন। তিনি পাথরগুলোকে সাথে নিয়ে নিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এদিকে জালূত ঘোষণা দিল যে, যে আমাকে হত্যা করতে পারবে সে আমার বাদশাহী পাবে। বিশাল দেহী জালূত এগিয়ে আসলে হযরত দাউদ (আ.) তার মাথার প্রতি লক্ষ্য করে পরপর পাথরগুলো নিক্ষেপ করেন। ফলে জালূত নিহত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে বাদশাহী এবং নবুয়ত প্রদান করেন, আর জালূতের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। –[বায়যাবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

مُبْتَلِيْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পরীক্ষাকারী।

نَهَرٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচন انهار অর্থ– নদী।

لَمْ يَطْعَمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلطَّعْمُ মূলবর্ণ (ط ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– স্বাদ গ্রহণ করবে না।

اغْتَرَفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِغْتِرَافُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ف) অর্থ– অঞ্জল ভর্তি করল।

شَرِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা পান করেছে।

جَاوَزَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُجَاوَزَةُ মূলবর্ণ (ج ـ و ـ ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে অতিক্রম করে।

مُلٰقُوا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ– (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাৎকারীগণ।

بَرَزُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبُرُوْزُ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ز) জিনস صحيح অর্থ– তারা বের হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ : এখানে ان হলো حرف مشبه بالفعل ও اللّٰه হলো اِنَّ-এর اسم আর مُبْتَلِيْ হলো شبه فعل এতে هُوَ যমীর نائب فاعل এবং كُمْ টি ضمير مفعول আর بِنَهَرٍ টি جار ও مجرور উভয়টি মিলে متعلق হয়েছে। এবার شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে ان এর خبر হয়েছে। এবার ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللهِ : এখানে كَمْ টি خبرية ، مميزة এবং مِنْ টি حرف جار ও فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ টি موصوف ও صفت মিলে مجرور হয়েছে। এবার جار ও مجرور মিলে تميز অতঃপর مميزة ও تميز মিলে مبتدأ হয়েছে, غَلَبَتْ ফে'ল, এতে هِيَ যমীর ফা'য়েল, যা প্রথম فِئَةٌ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। فِئَةً كَثِيْرَةً মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী, بِاء হরফে জার, اِذْنِ اللّٰه মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। এখন ফে'ল, ফা'য়েল, মাফঊল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ : এখানে واو টি হরফে আতফ قَتَلَ ফে'ল دَاوٗدُ ফায়েল جَالُوْتَ মাফঊল, এখন ফে'ল ফায়েল ও মাফঊল মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاٰتٰهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ এখানে واو টি حرف عطف আর اٰتَا ফে'ল, এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল, ـهٗ টি প্রথম মাফঊল الْمُلْكَ মা'তূফ আলাইহি واو টি حرف عطف এবং الْحِكْمَةَ মা'তূফ। অতঃপর মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে দ্বিতীয় মাফঊল। অতএব ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফঊল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ : এখানে واو টি حرف عطف আর عَلَّمَ ফে'ল, এতে هُوَ যমীর ফায়েল, ـهٗ টি مفعول এবং مِنْ টি হরফে জার مَا টি ইসমে মাওসূল, يَشَاءُ ফে'ল এবং এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল। অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে। অতএব, মাওসুল ও সিলাহ্ মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; এখন ফে'ল ফা'য়েল مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।